কৈফিয়ৎ

'নাগচম্পা' উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে দু'একটা কৈফিয়ত দেবার আছে। ঐ উপন্যাসে ব্যারিস্টার পি কে বাসু চরিত্রটা যখন আমি সৃষ্টি করি তখন আমি জানতাম না —তিনি 'উত্তম' অথবা 'অধম'। যদি জানতেম, তাহলে নিশ্চয় তাঁকে চিরকুমার রূপে চিহ্নিত করতেম না। অধম-এর এ ত্রুটি 'যদি জানতেম' চলচ্চিত্রের পরিচালক শ্রী দিলীপ মুখোপাধ্যায় সংশোধন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সেই উত্তম প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তকরণে মেনে নিয়েছি। ফলে, এখন থেকে ধরে নিতে হবে বাসু-সাহেব বিবাহিত এবং তাঁর পঙ্গু স্ত্রী বর্তমান।

দ্বিতীয় কথা, নাগচম্পা উপন্যাসে ঐ বাসু-সাহেব চরিত্রটাকে আমি রূপায়িত করেছিলাম একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ব্যোমকেশ বক্সী' চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছিলেন স্যার আর্থার কনান ডয়েল-এর বিশ্ববিশ্রুত গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌স-এর ছায়া দিয়ে। শার্লক হোম্‌স-এর সহকারী ডাক্তার ওয়াটসনের ছায়া দিয়ে গড়া অজিতবাবুকেও পেয়েছে বাংলা সাহিত্য। গোয়েন্দা গল্প যে চপল লঘু-সাহিত্য নয় এটা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন শরদিন্দু। তাঁর সাহিত্য আমার শিল্প প্রচেষ্টাকে নানাভাবে নানা যুগে প্রভাবিত করেছে। তাঁর 'ঝিন্দের বন্দী'তে বিদেশী কাহিনীকে খোল নলচে পালটে বাঙলাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় আমি এক সময়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার ফলশ্রুতি আমার 'মহাকালের মন্দির'। শুধু ভাব নয়, সেখানে শরদিন্দুর ভাষাও আমি অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছি। আরও পরিণত বয়সে লিখেছি 'আবার যদি ইচ্ছা কর'—সেখানে ভাষার বন্ধন আমি কাটিয়ে উঠেছিলাম। এবারেও শরদিন্দুবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি একটি বিদেশী গোয়েন্দাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি বাঙলা সাহিত্যে —যে চরিত্রটি স্ট্যানলি গার্ডনার-সৃষ্ট চরিত্র প্যারি মাসন, বার-এ্যাট-ল। গার্ডনারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রহস্যমোচন হয়েছে আদালতের কক্ষে। ওকালতি-প্যাঁচে।

ব্যোমকেশ চিরতরে অবসর নিয়েছেন। অজিতবাবুর কলম আজ স্তব্ধ। বাঙলা সাহিত্যের একটা দিক ফাঁকা হয়ে গেল। সেই গুরুতর অভাবটা পুরণ করতে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিমান কোনও সাহিত্যিক অগ্রসর হয়ে আসছেন না

কিরিটি, পরাশর বর্মা প্রভৃতিরাও এখন আত্মগোপন করে রয়েছেন। যেন মনে হচ্ছে এই দশকের বাঙালাদেশে খুন-জখম-রাহাজানি বুঝি সব বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রিমিনালরা বুঝি সব কারাপ্রাচীরের ওপারে—মিসায় আটক পড়েছে।

ফলে এই অক্ষম প্রচেষ্টা—'পি. কে. বাসু সিরিজ' এর অবতারণা। এই সিরিজে নাগচম্পাকে প্রথম কাহিনী হিসেবে ধরে নিলে বর্তমান কাহিনী হচ্ছে দ্বিতীয় কাহিনী।

পি. কে. বাসু যদি পাঠকদের মনোহরণে সমর্থ হন তাহলে তাঁর পরবর্তী কিছু কীর্তিকাহিনী শোনানোর বাসনা রইল।

নারায়ণ সান্যাল

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম

ব্যোমকেশ বক্সী-মশাই,

তোমার কীর্তিকাহিনী আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জেনেছি কয়েক দশক ধরে। গোয়েন্দা-কাহিনীকে তুমি ক্লাসিকাল সাহিত্যের সমপর্যায়ে উন্নীত করেছিলে। মৈনাককে তুমি মগ্ন হয়ে থাকতে দাওনি, দুর্গের রহস্য তুমি ভেদ করেছিলে, চিড়িয়াখানার কলকাকলীতে তুমি বিভ্রান্ত হওনি, শজারুর কাঁটা কার হৃৎপিণ্ডের কোন দিকে বিদ্ধ হচ্ছে তা একমাত্র তোমারই নজরে পড়েছিল। তুমি গোয়েন্দা নও, তুমি ছিলে সত্যান্বেষী! ৺অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে তুমি আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেলে চিরদিনের জন্য! তাই তোমাকেই স্মরণ করছি সর্বাগ্রে।

গ্রন্থকারের তরফে

পি. কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল

ক্রিররং-ক্রিং···ক্রিররং-ক্রিং !

কোনও মানে হয় ? দার্জিলিঙ-এর শীত। সকাল ছটা বেজে দশ। ছুটির দিন—দোশরা অক্টোবর, ১৯৬৮। গান্ধীজীর জন্মদিবস। সব সরকারী কর্মচারী আজ বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমাবে—শুধু ওরই নিস্তার নেই ! এই সাত সকালে টেলিফোনটা চিল্লাতে শুরু করেছে।

ক্রিররং ক্রিং···ক্রিররং-ক্রিং !

লেপটা গা থেকে সরিয়ে খাটের উপর উঠে বসে নৃপেন ঘোষাল—দার্জিলিঙ সদর-থানার দারোগা। দেখে, পাশের খাটে লেপের ফাঁক থেকে সুমিতাও একটা চোখ মেলে তাকাচ্ছে। ঘোড়া দেখলেই মানুষে খোঁড়া হয়। নৃপেন আবার সটান শুয়ে পড়ে বলে—দেখতো ?

সুমিতা লেপটা টেনে দেয় মাথার উপর। স্বগতোক্তি করে একটা : দেখতে হবে না, রং নাম্বার !

অগত্যা আবার উঠে বসতে হয়। সুমিতা লেপের মায়া ত্যাগ করবে না। রং নাম্বার ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলে তো বাঁচা যেত। ডি-সি-র ফোন হতে পারে, পুলিশ সুপারের হতে পারে—কে জানে, ট্রাঙ্ক-কল কিনা ! হাড়-কাঁপানো শীত অগ্রাহ্য করে উঠে পড়ে নৃপেন। হাত বাড়িয়ে হুক থেকে গরম ড্রেসিং-গাউনটা নামায়। গায়ে চড়াতে চড়াতে চটিটা পায়ে গলাতে থাকে।

সুমিতা মুখটা বার করে বলে, বেচারি !···কেন ঝামেলা করছ। শুয়ে থাক। ও আপনিই থেমে যাবে। কোথায় কোন সিঁধেল চুরি হয়েছে—

: সিঁধেল চুরিই হোক, আর বউ-চুরিই হোক—আরও বারো ঘণ্টা এ নরক যন্ত্রণা আমাকেই ভোগ করতে হবে—

ড্রেসিং গাউনের ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে ঘর ছেড়ে 'হল'-কামরায় পৌঁছানোর আগেই টেলিফোনটা দাঁত কিরমিরি করা বন্ধ করল।

: যা বাব্বা! ঠাণ্ডা মেরে গেলি?—মাঝ পথেই দাঁড়িয়ে পড়ে নৃপেন।

অনেকক্ষণ বাজছিল অবশ্য। হয়তো ও পক্ষের মানুষটা ভেবেছে—যাক্‌গে, মরুগগে—এখন আর ও-লোকটা কি ভেবেছে তা নিয়ে নৃপেনের কি মাথা ব্যথা? লোকটা যখন টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে তখন নৃপেনের দায়িত্ব খতম। ঘরে ফিরে আসে সে। ড্রেসিং গাউনটা খুলে আবার হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখে। হঠাৎ ওর দৃষ্টি চলে যায় কাচের জানালা দিয়ে উত্তর দিকে। অপূর্ব দৃশ্য। নির্মেঘ আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় মাথায় লেগেছে আবীরের স্পর্শ। উদয় ভানুর প্রথম জয়টীকা। এ দৃশ্য দেখতে এতক্ষণে নিশ্চয় ভীড় জমেছে টাইগার হিলের মাথায়—দূর দূরান্তর থেকে এসেছে যাত্রীদল, নৃপেনের কিন্তু কোন ভাবান্তর হল না। স্ত্রীকে ডেকে জানালো না পর্যন্ত খবরটা। একটা হাই তুলল সে। জানালার পর্দাটা টেনে দিয়ে উঠে বসল খাটে। লেপটা টেনে নিল আবার। নৃপেন ঘোষাল আজ একাদিক্রমে চার বছর আছে এই দার্জিলিঙে। সে হাড়ে হাড়ে জানে রোজ সকালে ভিখারী কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথার ঐ দগ্‌দগে ঘাটা ব্যাণ্ডেজ-খোলা কুষ্ঠ রুগীর মত সব্বাইকে দেখায়!

দার্জিলিঙ ওদের কাছে পচে গেছে। ঝাঁকার তলায় চেপটে যাওয়া টমেটোর মত লাল ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘার রঙের খেলায় আর ওদের কোন আকর্ষণ নেই। দু' বছর ধরে ক্রমাগত বদলির জন্য তদ্‌বির আর দরবার করে এসেছে। এতদিনে মা কালী মুখ তুলে চেয়েছেন। বদলির অর্ডার এসেছে। মায় ওর সাব্‌স্টিট্যুট পর্যন্ত এসে হাজির। আজই ওর শেষদিন এই হতভাগা দার্জিলিঙে। আর মাত্র বারো ঘণ্টা—হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম্ বারো ঘণ্টা এ নরক যন্ত্রণা ওকে ভোগ করতে হবে। ফোরনুনেই রমেন গুহ ওর কাছ থেকে

চার্জ বুঝে নেবে। আঃ! বাঁচা গেল। বদলি হয়েছে খাস কলকাতায়—একেবারে লালবাজারে। বলা যায় একরকম প্রমোশনই। নৃপেন লেপের নিচে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

সুমিতা বিস্তৃতা প্রকাশ করে: দেখলে তো? বললাম রঙ-নাম্বার!

: কোথায় আর দেখলাম? লোকটা তো বিরক্ত হয়ে ছেড়েই দিল।

: গরজ থাকলে ছাড়তো না। আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা কর দিকিন। কাল রাত দুটো পর্যন্ত যা দাপাদাপি করেছ!

তা করেছে। মালপত্র প্যাকিং হয়ে পড়ে আছে ঘর জুড়ে। ঘরে, হল-কামরায়, করিডরে। নানান আকারের প্যাকিং কেস আর ক্রেটিং। চার-বছরের সংসার, গুছিয়ে তোলা কি সহজ কথা? আজই ও-বেলায় নৃপেনরা নামবে। নামবে মানে কলকাতা-মুখো রওনা দেবে। মালপত্র যাবে ট্রাকে। হরি সিং-এর ট্রাক ঠিক এগারোটার সময় এসে দাঁড়াবে। ওরা যাবে জীপে। শিলিগুড়ি পর্যন্ত। তারপর ট্রেনে। রিজার্ভেসান করানোই আছে।

ওর সাক্‌সেসার রমেন গুহ এসে পৌঁছেছে গত কাল। রমেন ছেলে ভাল, নপেন একথা স্বীকার করবে। টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দিয়েছে। বস্তুত মাসের শেষদিনে। আর কেউ হলে অন্তত একটা দিন অপেক্ষা করত। মাসমাহিনাটা নগদে হাতে নিয়ে চেয়ার ছাড়ত। রমেন তা করেনি। বেচারি লাস্ট পে সার্টিফিকেট কবে পাবে কে জানে? হীরের টুকরো ছেলে! কাল দুপুরেই এসে পৌঁছেছিল দার্জিলিঙে। হোটেলে মালপত্র নামিয়ে এসে দেখা করেছিল নৃপেনের সঙ্গে। নৃপেন বলেছিল, আবার হোটেলে উঠতে গেলে কেন রমেন? এ ফ্ল্যাটে তো তিনখানা ঘর। অসুবিধা কিছুই হবে না। তুমি হোটেল ছেড়ে এখানে চলে এস।

রমেন গুহ রাজী হয়নি। জবাবে বলেছিল, কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছ ভাই? তুমি বাঁধা-ছাদায় ব্যস্ত থাকবে, মিসেস ঘোষালও তাঁর বড়ি-আচারের বয়াম নিয়ে বিব্রত থাকবেন—এর মধ্যে উট্‌কো গেস্ট—

বাধা দিয়ে সুমিতা বলেছিল, আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। আমরা যদি ভাতে-ভাত খাই, আপনাকেও তাই খাওয়াব।

ঃ আমি তা খাব কেন?—জবাবে হেসে ও বলেছিলঃ রীতিমত বিরিয়ানি পোলাও আর মুরগীর রোস্ট চাই আমার। কলকাতায় বদলি হচ্ছেন! ইয়ার্কি নাকি?

এক গাল হেসে সুমিতা বলেছিল, বেশ তাই খাওয়াব। হোটেলের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে আসুন আপনি।

রমেন মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিলঃ আমারও বদলির চাকরি মিসেস ঘোষাল। শেষ দিনটা কিভাবে কাটে তা কি আমি জানি না? আপনার হাতে পোলাও-মাংস নিশ্চিত খাব, তবে এখানে নয়! আপনারা কলকাতায় গিয়ে গুছিয়ে বসুন; আমি যখন সরকারী কাজে কলকাতায় ট্যুরে যাব, তখন ডব্‌ল্‌ ডি. এ ক্লেম করব আর আপনার হাতের রান্না খাব। বুঝলেন?

নৃপেন জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় উঠেছ তুমি? কোন হোটেলে?

ঃ 'হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা'। ম্যাল-এর ওপাশে। চেন?

ঃ খুব চিনি। দার্জিলিঙ আমার নখদর্পণে। ওর ম্যানেজার তো একজন সিন্ধি-ভদ্রলোক, নয়? কি যেন নাম?

ঃ ম্যানেজারকে দেখিনি, তবে কাউন্টারে যে ছোকরা বসেছিল সে বাঙালী। মালপত্র নামিয়ে রেখেই আমি তোমার এখানে চলে এসেছি—

সুমিতা আবার বলে, বেশ, হোটেলে রাত কাটাতে চান কাটান, রাত্রে কিন্তু আমার এখানেই খেতে হবে।

ঃ কেন ঝুট-ঝামেলা পাকাচ্ছেন সখ করে?

ঃ ঝামেলা নয় মোটেই। শুনুন, আমি আজ রাঁধব না। বাসন-

পত্রও সব প্যাক হয়ে গেছে। হোটেলে খাবার অর্ডার দেব। আপনার মুখ ফস্‌কে যখন কথাটা বেরিয়ে গেছে তখন আজই আপনাকে খাওয়াব—ঐ বিরিয়ানি পোলাও আর মুরগীর রোস্ট! আজই! এখানেই—

রমেন তবু বলে, কিন্তু আমার সর্তটা ছিল অন্যরকম। হোটেলের রান্না নয়, আপনার শ্রীহস্ত-পক্ক—

বাধা দিয়ে সুমিতা বলে ওঠে, না সর্ত মোটেই তা ছিল না। সর্ত ছিল—আপনি যখন কলকাতায় গিয়ে ডবল্ ডি. এ ক্লেম করবেন তখন আমার হাতের রান্না খাবেন। তাই নয়?

রমেন হেসে ফেলেছিল: ঠিক কথা! আমারই ভুল!

: ক্রিররং-ক্রিং—ক্রিররং-ক্রিং!

আবার উৎপাত! এ তো মহা বখেড়া হল দেখা যাচ্ছে। নৃপেন কাতর ভাবে সুমিতার দিকে তাকায়। সুমিতা উঠে বসে এবার। চীৎকার করে বলে—না, নৃপেনকে নয়, টেলিফোনকে—মশাই শুনছেন! ঘণ্টা-ছয়েক পরে ফোন করবেন! ও. সি-সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন, তখন থাকবেন না!

যন্ত্রটা এ উপদেশে কান দিল না। এক গুঁয়েমি চালিয়েই চলে: ক্রিররং-ক্রিং!

দুত্তোর নিকুচি করেছে! উঠে পড়ে সুমিতা! দুম দুম করে পা ফেলে চলে আসে হল-কামরায়। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলে, বলুন?···হ্যাঁ, আছেন। না, ঘুমোচ্ছেন না। আপনি কোথা থেকে বলছেন?

নৃপেন কর্ণময়।

: কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেল থেকে? মিস্টার গুহ বলছেন?···না? কী!···সে কি!!

এবার খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে নৃপেন। ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়াবার কথা আর মনেই থাকে না। সুমিতার কণ্ঠস্বরে

এমন একটা .কিছু ছিল যাতে নৃপেন দৌড়ে এসে বলে, কী হয়েছে সুমিতা?

সুমিতা জবাব দেয় না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে! শীতেই কিনা বোঝা গেল না, সে রীতিমত কাঁপছে। দ্রুতহাতে নৃপেন রিসিভারটা কেড়ে নেয়, বলে: ও. সি সদর বল্‌ছি। কে আপনি?··· ইয়েস। কী? কী বলছেন মশাই! অসম্ভব!!

সুমিতা ইতিমধ্যে বসে পড়েছে সামনের চেয়ারখানায়।

দীর্ঘ সময় নৃপেন আর কিছু বলে না টেলিফোনে, শুধু শুনে যায়। তারপর বলে, কোন কিছু ছোঁবেন না। ঘরটা তালাবন্ধ করে রাখুন। আমি পনের মিনিটের ভিতর আসছি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সে ঘুরে দাঁড়ায়। সুমিতার মুখোমুখি। বলে, শুনলে?

সুমিতা জবাব দেয় না। মাথাটা নাড়ে শুধু।

: কী হতে পারে বলত? হার্টফেল? থম্বোসিস্?

: আমি···আমি এখনও বিশ্বাসই করে উঠতে পারছি না। কাল রাত্রেও ভদ্রলোক কত হাসি-মশকরা করে গেলেন। ওঁর এঁটো প্লেটটা পর্যন্ত এখনও—

নৃপেনের দৃষ্টি চলে যায় ডাইনিং টেবিলে। তিনটি ভুক্তাবশিষ্ট প্লেট। রমেন গুহর প্লেটে পাশাপাশি দু'খানা ঠ্যাঙ! রাত পৌনে দশটা নাগাদ রমেন হোটেলে ফিরে যায়। আর আজ সকাল ছ'টা দশে সে লোকটা বেঁচে নেই? ইম্পসিবল্!

॥ দুই ॥

সকাল সাড়ে সাতটা। হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার ম্যানেজারের ঘরে জমিয়ে বসেছিল নৃপেন। এখন আর ঘুম-ঘুম চোখ স্লিপিং সুট পরা নৃপেনবাবু নয়, ধরা-চূড়া-সাঁটা দার্জিলিঙ সদর থানার জাঁদরেল ও.সি। সমস্ত হোটেলটা সে ইতিমধ্যে মোটামুটি ঘুরে দেখেছে। তন্ন-তন্ন করে তল্লাশী করেছে দোতলার তেইশ নম্বর কামরাটা। রমেন গুহর মৃতদেহ এখনও অপসারিত হয়নি। ওর মৃত্যুশীতল পা দুটো দেখে নৃপেনের মনে পড়ে গেল একটু আগে দেখা একটা ডিনার প্লেটে পাশাপাশি শোয়ানো ভুক্তাবশিষ্ট মুরগীর ঠ্যাঙ জোড়া। পুলিশ ফটোগ্রাফার এসে ফটো নিয়ে গেছে। দেহটা ময়না-তদন্তের জন্য পাঠানো হয়নি এখনও। ইতিমধ্যে টেলেক্স চলে গেছে ক'লকাতায়, লালবাজার কন্ট্রোলরুমে। হয়তো রমেন গুহর পরিবারেও এতক্ষণে দুঃসংবাদটা পৌঁছে গেছে। যতক্ষণ না কেউ এসে পৌছাচ্ছে ততক্ষণ দেহটা ঠাণ্ডা ঘরে রাখতে হবে। কেসটা আত্মহত্যাই—থম্বোসিস্-টম্বোসিস্ নয়—যদিও এখনও কিছু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবু বড়-কর্তার হুকুম ছাড়া দেহটা দাহ করাও চল্‌বে না। সুবীর হেড-কোয়ার্টার্সে থাকলে ভাল হত। ছোকরার মাথাটা এসব বিষয়ে বেশ খেলে। দুর্ভাগ্যবশত সুবীর রায় দিন-তিনেক আগে একটা তদন্তে কার্শিয়াঙে নেমেছে। সুবীর ওর অধীনে পোস্টেড বটে, তবে ক্রিমিনাল-ইনভেস্টিগেশন বিষয়ে সে বিশেষ ট্রেনিং নিয়েছে। তুখোড় ছোকরা! এসব বিষয়ে স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডকে টেক্কা দিতে পারে।

হার্টফেল যে নয়, কেসটা যে আত্মহত্যাই তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। মৃত রমেন গুহ আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে তার খাটে; আর তার ডান হাতে ধরা আছে একটা কাচের গ্লাস। আশ্চর্য!

গ্লাসটা কাত হয়ে যায়নি—বস্তুত নৃপেন যখন ওকে পরীক্ষা করে তখনও মৃতদেহের ডান হাতে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরা ছিল ঐ গ্লাসটা—ঐ যে 'রিগর-মর্টিস্' না কি যেন বলে! নৃপেনের দৃঢ় বিশ্বাস গ্লাসের তরল পানীয়ে কোন তীব্র বিষ মিশিয়ে রমেন পান করেছে। বিষটা এতই তীব্র যে, তৎক্ষণাৎ ওর মৃত্যু হয়েছে! কিন্তু হঠাৎ এভাবে আত্মহত্যা কেন করল রমেন? কই গতকাল রাত্রেও তো সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। যে লোক মধ্যরাত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সে কি সন্ধ্যারাত্রে ওভাবে হাসি-মশকরা করতে পারে? কিন্তু হত্যাই বা হবে কি করে? রমেনের ঘর ছিল তালাবন্ধ! হোটেলে সে সবেমাত্র এসেছে। তার হাতের ঘড়ি, পকেটের পার্স পর্যন্ত খোয়া যায়নি। এখানে কেউ তাকে চেনে না, জানে না। কে, কোন উদ্দেশ্যে তাকে খুন করবে? তাছাড়া তালাবন্ধ ঘরে সে ঢুকবেই বা কি করে?

ঃ স্যর!

ঃ উঁ?—সম্বিত ফিরে পায় নৃপেন দারোগা।

হাত দুটি গরুড় পক্ষীর মত জোড় করে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হোটেলের ম্যানেজার। বিনীতভাবে বলে, মুর্দাকে এবার হটাবার হুকুম দিয়া যায় সাব্। পূজা মরশুম। হমার সব বোর্ডার ভাগিয়ে যাবে!

একটা বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নৃপেন বলে, মুর্দা! ও লোকটা কে জান? বেঁচে থাকলে ও আজ বসত আমার চেয়ারে! ও একজন দারোগা!

ম্যানেজার জগীন্দর কাপাডিয়া একটি তিনদুর্গ-আঁকা সবুজ টিন বাড়িয়ে ধরে! তার গর্ভে সাদা সিগারেট। যোগীন্দর গলাটা সাফা করে, মুর্দার যে জাত নেই এমন একটা দার্শনিক উক্তি করবে কিনা বুঝে উঠতে পারে না।

পাশ থেকে ওর অফিস-ক্লার্ক মহেন্দ্র বলে, সে আমরা জানতাম স্যার! দেখুন দেখি, কী কাণ্ড হয়ে গেল!

নৃপেন ত্রি-দুর্গ আঁকা টিন থেকে একটি সিগারেট নিয়ে ধরায়। এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, এখন বল দিকিন—কে ওকে প্রথম ঐ অবস্থায় আবিষ্কার করে?

ঃ রুম-বেহারা স্যার। বীর বাহাদুর। বেড-টি দিতে গিয়ে—

বাধা দিয়ে নৃপেন বলে উঠে, নো সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড স্টোরি প্লীজ! রুম-বেহারাকো বোলাও!

শুধু রুম-সার্ভিসের বেহারা নয়, ডাক পড়ল অনেকেরই। ক্রমে ক্রমে এল তারা—এজাহার দিতে। কুক, হেডকুক, গেট-কীপার, কাউন্টার ক্লার্ক ইত্যাদি। টুকরো টুকরো জবানবন্দী থেকে সংগৃহীত হল সম্পূর্ণ কাহিনীটা। হোটেল রেজিস্টার অনুযায়ী রমেন গুহ এসে পৌঁছায় পয়লা তারিখ বেলা বারোটায়। দোতলার তেইশ নম্বরে আশ্রয় নেয়। সাড়ে বারোটায় সে মালপত্র রেখে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে রাত দশটায়। কোনও 'মীল' নেয়নি সে। এমন কি এককাপ চা পর্যন্ত খায়নি। তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে পরদিন সকাল ছটায়।

কাউন্টার-ক্লার্ক মহেন্দ্রের জবানবন্দী অনুসারে কাল দুপুরে একটি ট্যাক্সি চেপে রমেন গুহ আসে। শেয়ারের ট্যাক্সি নিউ জলপাই-গুড়ি থেকে এসেছে। ট্যাক্সিতে তিনজন লোক ছিল। তিনজনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলে ওঠে। দ্বিতলের পাশাপাশি তিনখানা সিংগ্‌ল-সীটেড রুম ভাড়া নেয়। অথচ ওরা তিনজন পৃথক যাত্রী। ওরা পরস্পরকে চিনত না।

বাধা দিয়ে নৃপেন প্রশ্ন করেছিল, তুমি কেমন করে জানলে ওরা পরস্পরকে চিনত না?

ঃ স্বচক্ষে দেখলাম স্যার! ট্যাক্সি থেকে মালপত্র নামিয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভার এসে দাঁড়াল। ওঁরা তিনজনে ট্যাক্সি-ভাড়ার এক-তৃতীয়াংশ দিলেন। তারপর আমার হোটেল-রেজিস্টারে পর পর নাম

লেখালেন। ঠিকানা সব আলাদা। একজন হিন্দু, একজন মুশলমান, একজন খ্রীষ্টান।

: ঠিক আছে। এবার বল—রমেন গুহর সহযাত্রী দু'জন কত নম্বরে আছেন ?

মহেন্দ্র মাথা চুলকে বলে, সেইখানেই তো ঝামেলা হয়েছে স্যার। দু'জনেই ইতিমধ্যে চেক-আউট করে বেরিয়ে গেছেন।

: বল কি ! কাল বেলা বারোটায় চেক-ইন করে আজ সকাল সাতটাতেই চেক-আউট ?

: দু'জনেই নয় স্যার। মিস্টার মহম্মদ ইব্রাহিম চেক-আউট করেছেন কাল রাত সাড়ে আটটায় আর মিস্ ডিক্রুজা আজ ভোর পাঁচটায় !

: মিস্ ডিক্রুজা ! মেমসাহেব ?

: না স্যার। দিশি মেম-সাহেব। দেখলে বাঙালী বলেই মনে হয়।

: ভোর পাঁচটায় ! অত ভোরে ?

: হ্যাঁ স্যার। টাইগার-হিলে সান রাইস দেখতে গেলেন যে। বললেন আজই নামবেন। মালপত্র নিয়েই চেক-আউট করে বেরিয়ে গেলেন।

সন্দেহজনক ! অত্যন্ত সন্দেহজনক। রমেন গুহ মারা গেছে রাত দশটার পরে। তেইশ নাম্বার ঘরে। আর ঠিক তার পাশের ঘরের বাসিন্দা কাকডাকা ভোরে হোটেল ছেড়ে দিল ! পরবর্তী ঠিকানা না রেখে ? অবশ্য মহম্মদ ইব্রাহিমকে সন্দেহ করার কিছু নেই। সে চেক-আউট করেছে রাত সাড়ে আটটায়—রমেন তখনও নৃপেনের বাড়িতে। বহাল তবিয়তে। মহম্মদ ইব্রাহিম আর মিস্ ডিক্রুজার স্থায়ী ঠিকানা দুটো নৃপেন লিখে নিল তার নোট বইতে। খোদায় মালুম সেগুলো আদৌ সত্য কিনা। কাউন্টার-ক্লার্ক ছোকরাটি বেশ চল্‌তা-পুর্জা ! অনেক খবর দিতে পারল সে ঐ দু'জনের সম্বন্ধে। ছোকরা লক্ষ্য করেছে অনেক কিছুই। মিস্ ডিক্রুজার বয়স সাতাশ-আটাশ, যদিও সাজে-সজ্জায় সে নিজেকে বাইশ-তেইশ বলতে চায়।

সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। বিজ্ঞের মত বললে—ভাইট্যাল স্ট্যাটিশ-টিক্স হবে, এই ধরুন ৩৪-২৮-৩২। চুল ছোট, বব্ নয়। রঙ মাজা, ফর্সা ঘেঁষা। খুব ভাল বাঙলা বলতে পারে—নাম না বললে বাঙালী বলে ভুল হতে পারে। সিগারেট খায়। 'প্রফেশান'-এর ঘরে লেখা আছে 'হাসিফ'। মিস্ কি করে গৃহকর্ত্রী হয় তা জানে না মহেন্দ্র। তবে সে তাতে আপত্তি করেনি। তার সঙ্গে আছে একটা ভি. আই. পি -মার্কা সাদা সুটকেশ। অপর পক্ষে মহম্মদ ইব্রাহিমের বয়স ত্রিশের উপর, চল্লিশের নিচে। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ গঠন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও গোঁফ আছে, চোখে চশমা। পাইপ খান। প্রফেশান—তাঁর স্বীকৃতি-মত—বিজনেস।

হেড-কুক সবিনয়ে নিবেদন করল খাবারে কোনক্রমেই কোন বিষাক্ত পদার্থ মিশে যেতে পারে না। তার যুক্তি প্রাঞ্জল: তাহলে তো হুজুর হোটেল শুদ্ধু লোক আজ মরে ভূত হয়ে থাকত।

নৃপেন ধমক দেয়, বাজে কথা ব'ল না। কে বলেছে খাবারে বিষ ছিল? রমেন তোমার কিচেনের খাবার খায়নি। কিন্তু ওর ঘরে থার্মোফ্লাস্কে জল রয়েছে দেখলাম। গরম জল তুমি সাপ্লাই করেছিলে?

হেডকুক সভয়ে নিবেদন করে, বোর্ডারের ঘরে থার্মোফ্লাস্কে জল থাকলে তা আমার কিচেন থেকেই সাপ্লাই হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু জল তো আমি স্রেফ কল থেকে নিয়ে গরম করেছি স্যার!

: জানি! নর্দমা থেকে নেওনি! কিন্তু জলটা ওর ঘরে কে রেখে এসেছিল?

: তার জিম্মাদারী আমার নয় হুজুর। রুম-সার্ভিস বেহারার কাজ ওটা।

: হুঁ। কী নাম সেই রুম-সার্ভিসের বেহারার?

: বীর বাহাদুর, স্যার!

: বীর বাহাদুর কার নাম?

কেউ সাড়া দেয় না।

নৃপেন প্রচণ্ড ধমক লাগায় : আধঘণ্টা থেকে ডাকছি, বীর বাহাদুর আসছে না কেন? এরা ভেবেছে কি দারোগা খুন করে পার পাবে! সব কটার মাজায় দড়ি বেঁধে চালান দেব আমি!

একটা রীতিমত শোরগোল পড়ে যায়। দু'তিনজন ছোটে বীর বাহাদুরের খোঁজে। যোগীন্দর কাপাডিয়া কি করবে ভেবে না পেয়ে আবার থ্রি-কাস্‌ল্‌স্‌-এর টিনটা বাড়িয়ে ধরে। নৃপেন আবার একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়।

তিনচার জনে ইতিমধ্যে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে বীর বাহাদুরকে। বেচারির পিতৃদত্ত নামের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত অবলুপ্ত। বীরত্ব এবং বাহাদুরি। নবমীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ালো দারোগা সাহেবের সামনে!

: তোমার নাম বীর বাহাদুর?

: জী হ্যাঁ!

: তোম বীর হ্যায় ইয়ে বাহাদুর হ্যায়?

বেঁটে লোকটা কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

অনেক জেরার পরে লোকটা হলফ্ খেয়ে বললে, সে থার্মোফ্লাস্কে বিষ-টিষ কিছু মেশায়নি। তার বিশ বছরের নোকরি! এমনটি এর আগে কখনও হয়েছে?

: তুমি ফ্লাস্কটা নিয়ে কিচেন থেকে সোজা ঐ তেইশ নম্বর ঘরে গিয়েছিলে, না কি ফ্লাস্কটা আর কারও হাতে ধরতে দিয়ে বিড়ি-টিড়ি খেয়েছিলে?

: জী নেহী সাব! ম্যয় বিড়ি নেহি পীতা!

: হেত্তেরি! যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। সিধে তেইশ নম্বরমে গয়া থা ক্যা?

: জী সাব!

: ঠিক আছে! এবার আজ সকালের কথা ব'ল। কখন তুমি প্রথম জানতে পারলে?

বীর বাহাদুর যে বর্ণনা দিল তা সংক্ষেপে এই ঃ

হোটেলের আইন অনুসারে রাত সাড়ে দশটার পর রুম-সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। ভোর সাড়ে চারটের আগে আর রুম-সার্ভিস পাওয়া যায় না। টাইগার-হিলে যাবার বায়নাক্কা থাকায় প্রায় প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু বোর্ডারকে ভোর সাড়ে চারটেয় বেড-টি দিতে হয়। তাই শেষরাত্রে অন্ধকার থাকতেই কিচেনটি কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাধা দিয়ে নৃপেন প্রশ্ন করে, রুম নম্বার চব্বিশে বেড-টির অর্ডার ছিল আজ ?

ঃ জী নেহী ! চব্বিশ মে থী বহ্ মেমসাব। উস্‌নে বেড-টি নেহী লি-থি।

নৃপেন মহেন্দ্রর দিকে ফিরে বললে, তবে যে তখন তুমি বললে—মিস্ ডিক্রুজা আজ সকালে টাইগার-হিলে গেছে ?

মহেন্দ্র আমতা আমতা করে বললে, ইয়ে, টাইগার-হিলে যেতে হলে চা খেয়ে যেতে হবেই, এমন কোন আইন নেই স্যার !

ঃ আমি জানি। বাজে কথা বল না !—ধমক দেয় নৃপেন দারোগা। তারপর বীর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলে, তেইশ নম্বরে বেড-টির অর্ডার ছিল ?

ঃ জী সাব। পৌনে ছে বাজে !

ব্যাপারটা বিস্তারিত করে বুঝিয়ে দেয় বীর বাহাদুর। তেইশ নম্বরে ছিলেন এক দারোগা সাহেব। মানে যিনি মারা গেছেন। তিনি পৌনে ছ'টায় চা চেয়েছিলেন। বীর বাহাদুর ঠিক সময়ে চায়ের ট্রে নিয়ে ওঁর দরজার সামনে এসে নক্ করে। কেউ সাড়া দেয় না। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে। তবু কেউ সাড়া দেয় না। ঐ সময় ওদিককার খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক সাহেব পাইপ খাচ্ছিলেন। তিনি বাহাদুরকে বলে ওঠেন, 'কেন হোটেল শুদ্ধ লোকের সুখনিদ্রায় বাধা দিচ্ছ বাবা ? তোমার ঐ কুম্ভকর্ণ-সাহেবের ঘুম যখন ভাঙবে তিনি নিজেই চা চাইবেন।' তখন বাহাদুর সেই পাইপ-মুখো

সাহেবকে বলেছিল, 'এমন কাণ্ডটা ঘটলে ম্যানেজার রাগ করবেন স্যার। উনি ভাববেন, আমি মিছে কথা বলছি—সময়মত বেড-টি দিতে আসিনি আমি।' তখন সেই পাইপমুখো সাহেব বললেন, 'তুমি আমাকে সাক্ষী মেন বাবা। আমি দরকার হলে আদালতে হলফ নিয়ে বলব—তোমার চেষ্টার ক্রুটি ছিল না।'

নৃপেন প্রশ্ন করে, উনি অত ভোরে ঐ ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন ?

ঃ বহ্ নেহি জানতা সাব !

মহেন্দ্র উপর পরা হয়ে বলে, ঐ বারান্দা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সান রাইস দেখা যায় স্যার। উনি বোধহয়—

ঃ তুমি চুপ কর !—ধমক দিয়ে ওঠে নৃপেন। তারপর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলে, তারপর ? বলে যাও—

বীর বাহাদুর তার জবানবন্দী শুরু করে। ঠিক ঐ সময়েই নাকি সেই তেইশ নম্বর ঘরের ভিতর একটা এ্যালার্ম ক্লক বেজে ওঠে। পুরো এক মিনিট সেটা বাজে। তাতেও ঘরের ভিতর কোন সাড়া শব্দ জাগে না। পাইপ-মুখো সাহেব এবার কৌতূহলী হয়ে নিজেই এগিয়ে আসেন। চাবির ফুটোয় চোখ লাগিয়ে বলে ওঠেন, আশ্চর্য ! ঘরে আলো জ্বলছে ! এরপর উনি একটা দেশলাই জ্বেলে দরজার উপর কার্ড আটকানো খোপটা দেখে বলে ওঠেন, 'রমেন গুহ ! পুলিশের লোক নাকি ?' বীর বাহাদুর জবাবে বলেছিল, 'জী সাব !' পাইপমুখো তখন বলেন, 'তবে তো আমার চেনা লোক মনে হচ্ছে। তুমি এক কাজ করতো হে ! কাউন্টারে গিয়ে এ ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে এস।' বীর বাহাদুর অগত্যা ট্রেটা নামিয়ে রেখে এক-তলায় কাউন্টারে ফিরে যায়। কাউন্টার ক্লার্ক মহেন্দ্র বাহাদুরকে একটা 'মাস্টার কী' দেয়। সেটা নিয়ে বাহাদুর—

ঃ দাঁড়াও ! দাঁড়াও—এখানেই বীর বাহাদুরের জবানবন্দী থামিয়ে নৃপেন মহেন্দ্রের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে—'মাস্টার কী' বস্তুটা কি ?

: প্রতি ঘরের 'ডুপ্লিকেট কী' ছাড়াও আমার কাছে দুটো মাস্টার-কী আছে। তার একটা চাবি দিয়ে এক তলার সব ঘর খোলা যায়। দ্বিতীয়টা দিয়ে দোতলার সব ঘর খোলা যায়।

: আই সী। তা তুমি বাহাদুরকে ঐ তেইশ নম্বর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা না দিয়ে ফস্ করে 'মাস্টার কী' দিয়ে বসলে কেন ?

: তেইশ নম্বর ঘরের দুটো চাবিই ঐ গুহ-সাহেব আমার কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিলেন।

: দুটো চাবিই তোমরা বোর্ডারকে দাও ?

: না স্যার। তবে আমি জানতাম ঐ গুহ-সাহেব আপনার জায়গায় বদলি হয়ে আসছেন। তাই—

: বুঝেছি!—নৃপেন এবার বাহাদুরের দিকে ফিরে বললে: প্রসীড!

বুঝতে অসুবিধা হল না বাহাদুরের। সে তার জবানবন্দীর সূত্র তুলে নেয়।

মাস্টার-কী দিয়ে দরজা খুলে ওরা দু'জনে ঘরে ঢোকে—বাহাদুর আর সেই পাইপ-মুখো সাহেব। দেখে, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। টেবিলের উপর মুখ বন্ধ করা একটা জলের ফ্লাস্ক, একটা হুইস্কির বোতল, এক প্যাকেট ক্যাপ্‌স্টান সিগারেট, একটা দেশলাই একটা এ্যাসট্রে আর একটা এ্যালার্ম ক্লক। রমেনের হাতে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা আছে একটা কাচের গ্লাস—তাতে ঈষৎ পীতাভ কিছু তরল পানীয়। সম্ভবত গরমজলে মেশানো হুইস্কি ছিল ঘণ্টা কতক আগে—তখন বরফ-ঠাণ্ডা। বীর বাহাদুর কোনক্রমে চায়ের ট্রেটা নামিয়ে রাখে। পাইপ-মুখো সাহেব রমেনকে পরীক্ষা করেন। নাড়ি দেখেন, কানের নিচে চোয়ালের তলায় কী একটা পরীক্ষা করেন। তারপর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলেন, 'মারা গেছে। তোমার ম্যানেজারকে খবর দাও।'—বাহাদুর হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে নিচে।

: সে কি! ঐ পাইপ-মুখো সাহেবকে ঐ ঘরে একা রেখে?

: জী হুজুর। ইয়ে তো বাতায়া বহ্‌। কহা কি ম্যানেজারকে সেলাম দো!

: সেলাম দেওয়াচ্ছি!—নৃপেন ঘুরে দাঁড়ায় যোগীন্দরের মুখোমুখি। বলে, কী মশাই, তবে যে বললেন মৃতদেহ আবিষ্কারের পরে ও ঘরে কেউ ঢোকেনি? ওটা তালাবন্ধ পড়ে আছে!

যোগীন্দর আমতা আমতা করে। মহেন্দ্র বলে, ইয়ে—বাহাদুর নিচে এসে খবর দেওয়া মাত্র আমি দৌড়ে ঐ ঘরে উঠে যাই। মিনিট তিন-চারের বেশি ঐ বোর্ডার-ভদ্রলোক ও ঘরে একা ছিলেন না।

: থাম তুমি! হুঁঃ! তিন-চার মিনিট! চার-মিনিট কি কম সময়? ওর ভিতর অনেক কিছু করে ফেলা যায়, বুঝেছ! সব কটার মাজায় দড়ি বাঁধব আমি।

যোগীন্দর সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরবে কি না ভেবে পায় না। নৃপেনের আগের সিগারেটটা তখনও শেষ হয়নি।

: ঐ পাইপ-মুখো কি হোটেলে আছেন, না কি তাঁকেও চেক-আউট করিয়ে দিয়েছ?

মহেন্দ্র হাত কচলে বলে, না স্যার, উনি আছেন। এক তলায় একটা ডবল-বেড রুম নিয়ে আছেন। সস্ত্রীক।

: দেখবে, যেন তিনি না ইতিমধ্যে কেটে পড়েন। তাঁকে খবর দাও—আমি দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর ঘরে যাচ্ছি। তাঁর এজাহারটা নিতে হবে—

যোগীন্দরের ইঙ্গিতে একজন তখনই চলে গেল পাইপ-মুখোকে রুখতে।

: তারপর? উপরে এসে কী দেখলে? না তুমি নয়—বাহাদুর তুমি বল। পাঁচ মিনিট পরে যখন তুমি উপরে এলে তখন কী দেখলে? পাইপ-মুখো কী করছিলেন তখন?

: তামাম কামরাঠো তালাশ্‌ করতা থা!

: বাঃ বাঃ বাঃ! চমৎকার!—নৃপেন দারোগা দগ্ধাবশেষ

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যোগীন্দরের দিকে ফেরে। বলে, কী মশাই ? আপনি অম্লানবদনে বললেন ঘরটা বরাবর তালাবন্ধ আছে! কেউ কিছু টাচ করেনি, ট্যাম্পার করেনি ?

যোগীন্দর তৎক্ষণাৎ সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরে।

: দূর মশাই! সিগারেট নিয়ে কি করব ? যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন!

যোগীন্দর হাত দুটি জোড় করে বললে, স্যার! বাসু-সাহেবকে আমি বিশ বরিষ ধরে জানি। নাম করা ব্যারিস্টার! উনি কোন কিছু ট্যাম্পার করতেই পারে না।

: বাসু-সাহেব! কে বাসু-সাহেব ?

: ঐ যাঁকে বীর বাহাদুর পাইপ-মুখো সাহেব বলছে। ওঁর নাম পি. কে. বাসু আছে। উনি বহুবার আমার হোটেলে উঠেছেন। একদম শরীফ আদমি! এককালে ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসাবে লাখ লাখ টাকা খিঁচেছেন। এখন প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন।

: লাখ লাখ টাকা খেঁচার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরির কোন সম্পর্ক নেই, বুঝেছেন ? যাক তাঁর সাথে তো এখনই কথা বলব। তারপর কি হল বলুন ?

জবাব দিল মহেন্দ্র—তারপর আর কি ? আমরা ঘরটা তালাবন্ধ করে নেমে এলাম। আপনাকে ফোন করলাম। ঠিক ছটা বেজে দশে।

ইতিমধ্যে একজন বেহারা এসে দাঁড়ায়। তার হাতে একটা খালি ব্র্যাণ্ডির শিশি। নৃপেন সেটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, খুব ভাল করে ধুয়েছিস তো ?

: হ্যাঁ স্যার! খুব ভাল করে বার বার ধুয়েছি।

: ঠিক আছে। এবার আর একবার ঐ তেইশ নম্বর ঘরে যেতে হবে। চলুন।

তেইশ নম্বর ঘরে এসে নৃপেন স্বহস্তে ঐ কাচের গ্লাস থেকে

তরল পদার্থটা শিশিতে ভরে নিল। তারপর ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল। নেমে এল নিচে। সকলকে বিদায় দিয়ে একাই চলে এল নির্দেশমত একতলায় এক নম্বর ঘরে। সব ঘরেই ইয়েল-লক, ছিট-কানি নেই। অর্থাৎ দরজা ঠেলে বন্ধ করলে চাবিছাড়া দরজা খোলা যায় না। এক-নম্বর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ভারী পর্দা ঝুলছে। নৃপেন খোলা দরজায় 'নক্' করল। ভিতর থেকে আহ্বান এল: ইয়েস! কাম ইন প্লিস্!

পর্দা সরিয়ে নৃপেন প্রবেশ করল ঘরে।

ডবল-বেড বড় ঘর। একজন ভদ্রমহিলা বসেছিলেন একটা চাকা-ওয়ালা চেয়ারে। তাঁর হাতে একজোড়া উলের কাঁটা। উলের সোয়েটার বুনছিলেন। তাঁর মুখোমুখি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ড্রেসিং গাউন পরে বসেছিলেন ইজি চেয়ারে। বোধকরি কী একখানা বই পড়ে শোনাচ্ছিলেন স্ত্রীকে। বইটা মুড়ে এদিকে ফিরে বললেন, বসুন। মিস্টার ঘোষাল আই প্রিসিউম? ও. সি. সদর?

ঃ হ্যাঁ। আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।

ঃ নট দ্য লীস্ট, নট দ্য লীস্ট! বলুন, কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। বাই দ্য ওয়ে, আপনার হাতে ওটা কি? ব্র্যাণ্ডি?

ঃ না! মৃতের হাতের গ্লাসে যে তরল-পদার্থটা ছিল সেটা নিয়ে যাচ্ছি। কেমিক্যাল এ্যানালিসিস্ করাতে হবে।

ঃ ও! তা করান। তবে কী পাবেন তা আগেই বলে দিতে পারি। এ্যালকহল, এ্যাকোয়া আর কে. সি. এন!

ঃ 'কে. সিয়েন' মানে?

ঃ পটাসিয়াম সায়ানাইড!

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের এই বিদ্যে জাহির করবার প্রচেষ্টা দেখে নৃপেন মনে মনে হাসে। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারায় এমন একটা আভিজাত্য আছে যে, সে প্রকাশ্যে হেসে উঠতে পারল না। বললে, আপনি ব্যারিস্টার মানুষ! নিশ্চয় বুঝবেন, অমন আপ্তবাক্যে কোনও

কোর্টে কখনও কনভিক্‌শন্ হয় না। এটা এভিডেন্স হিসাবে তখনই গ্রাহ্য হবে যখন কোন বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক তাঁর ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করে একটা রিপোর্ট দেবেন।

ঃ কারেক্ট! কোয়াইট কারেক্ট! এ-ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট সত্ত্বেও ওটা এভিডেন্স হিসাবে গ্রাহ্য হবে না!

হাসি-হাসি মুখে বাসু-সাহেব তাকিয়ে থাকেন নৃপেন দারোগার দিকে। অর্থাৎ এবার তুমি জানতে চাও—কেন গ্রাহ্য হবে না? তা কিন্তু জানতে চাইল না নৃপেন। সে মনে মনে রীতিমত চটে উঠেছে এ ভদ্রলোকের অহেতুক মোড়লিতে। ওকে নীরব থাকতে দেখে বাসু-সাহেব নিজেই বলে ওঠেন—কেন গ্রাহ্য হবে না জানেন?

এতক্ষণে রুখে ওঠে নৃপেন, না, জানি না। জানতে চাইও না!

বাসু-সাহেব কিন্তু রাগ করেন না। হেসেই বলেন—গ্র্যাটিস্ লীগ্যাল এ্যাডভাইস্ আমি দিই না ; কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে না হয় ব্যতিক্রমই করলুম! আপনার উচিত ছিল যে-সব সাক্ষীর সামনে ঐ তরল-পানীয়টা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের উপস্থিতিতেই ওটা সীলমোহর করা! ডিফেন্স কাউন্সিলারগুলো ভারী পাজি হয়, বুঝেছেন—তারা কিছুতেই মানতে চাইবে না বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে যে লিকুইডটার পরিচয় লেখা আছে সেটাই ঐ মৃত ব্যক্তির হাতে পাওয়া গেছে! বলবে, সীল যখন করা নেই তখন এ্যাকিউসড্‌কে ফাঁদে ফেলতে আপনি নিজেই ওতে কিছুটা হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড মিশিয়ে দিয়েছেন। ইন ফ্যাক্ট আপনি ইচ্ছে করলে এখনও তা মেশাতে পারেন। তাই নয়?

কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে ওঠে নৃপেনের!

ঃ যাক ও কথা। আমার কাছে কি জানতে চান বলুন?

অপমানটা গলাধঃকরণ করে নৃপেন আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। বলে, আপনিই মৃতদেহটা প্রথম আবিষ্কার করেন?

ঃ নট এক্স্‌জ্যাক্টলি! আমরা দুজন। আমি আর বীর বাহাদুর।

: এবং তার পরেই আপনি বীর বাহাদুরকে নিচে যেতে বলেন ?

: এ্যাফার্মেটিভ !

: আপনি কতক্ষণ ঐ ঘরে একা ছিলেন ?

: পাঁচ থেকে সাত মিনিট।

: ঐ পাঁচ-সাত মিনিট ধরে আপনি ঘরটা তন্ন তন্ন করে সার্চ করেছেন ?

: পাঁচ-সাত মিনিটে একটা ঘর তন্ন তন্ন করে সার্চ করা যায় না। মোটামুটি তল্লাসী করেছিলাম।

: কাজটা ভাল করেননি।

মিসেস বাসু তাঁর হুইল্ড চেয়ারটা চালিয়ে পিছনের বারান্দার দিকে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়েন এ-কথায়। বাসু-সাহেব হাসি-হাসি মুখেই বলেন, য়ু থিংক সো ?

রূঢ়তর কণ্ঠে নৃপেন বলে, হ্যাঁ, তাই মনে করি আমি। আপনি হয়তো কিছু ফিঙ্গার-প্রিন্ট নষ্ট করে ফেলেছেন, তল্লাস করতে গিয়ে।

: করিনি। আমার হাতে গ্লাভস্ পরা ছিল। তা ছাড়া এ-সব কেস কীভাবে হ্যাণ্ডেল্ করতে হয় আমার জানা আছে !

এবার আর আত্মসংবরণ করতে পারে না নৃপেন। রীতিমত ধমকের সুরে বলে, না ! আপনি অন্যায় করেছেন ! আপনি ক্রিমিনাল ল-ইয়ার, ডিটেকটিভ নন ! তবু ল-ইয়ার হিসাবে আপনার জানা থাকা উচিত যে, পুলিস এসে পৌছানোর আগে কোন কিছু পরীক্ষা করার অধিকার আপনার নেই !

মিসেস্ বাসু শঙ্কাভরা দু'চোখ মেলে বাসু-সাহেবের দিকে তাকালেন। তাঁর স্বামীকে তিনি ভালমতই চিনতেন। বাসু-সাহেবের সঙ্গে তাঁর [illegible] বোধকরি সেজন্যই কোনও বিস্ফোরণ হল না। [illegible]সু-সাহেব শান্ত [illegible] শুধু বললেন, লুক হিয়ার মিস্টার ও. [illegible] হেড-কোয়ার্টার্স ! আ[illegible] অধিকার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ

সচেতন। হিয়ার্স মাই কার্ড! আপনি যা ভাল বোঝেন করতে পারেন!

নৃপেন হাত বাড়িয়ে কার্ডটা গ্রহণ করে না। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

বাসু-সাহেব বলেন, আগেই বলেছি গ্র্যাটিস্ লীগাল এ্যাডভাইস দেওয়া আমার স্বভাব নয়। এ ক্ষেত্রে তবু দিতে বাধ্য হচ্ছি এজন্য যে, রমেন গুহ ছিল আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন!

: রমেন গুহ আপনার পরিচিত?—প্রশ্ন করে নৃপেন।

বাসু-সাহেব সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেন, এটা যে আত্মহত্যা নয়, বরং একটা ফার্স্ট ডিগ্রি ডেলিবারেট মার্ডার তার অকাট্য এভিডেন্স আমি পেয়েছি। যেহেতু কেসটা রমেন গুহর, তাই কতকগুলো ক্লু আপনাকে দিতে চাই। আপনি কি দয়া করে বসবেন?

নৃপেন বসে না। একগুঁয়ে ছেলের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে, কী ক্লু?

বাসু-সাহেব পাইপটা ধরালেন। বললেন, মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা শুনলেই কিন্তু আপনি ভাল করতেন। তাতে আপনার নেহাৎ আপত্তি থাকলে আমি বিপুলকেই সব কথা জানাব। আফটার অল, এটা রমেন গুহর কেস!

: বিপুল! বিপুল কে?

: ডি. সি. দার্জিলিঙ। বিপুল ঘোষ। তার স্ত্রী মণির মামা হই আমি।

নৃপেন বসে পড়ে। পথে নয়, চেয়ারে। বলে, বলুন, কী বলবেন?

: আপনি তদন্ত করে কী বুঝেছেন? এটা আত্মহত্যার কেস?

: না! রমেনের আত্মহত্যার কোন কারণ খুঁজে পাইনি আমি। গতকাল রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত সে আমার বাড়িতেই ছিল। দিব্যি স্বাভাবিক মানুষ। আমাদের সঙ্গেই রাত্রে খেয়েছে, হাসি-গল্প

করেছে—হোটেলে ফিরে এসে সে তার স্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছে তাতেও কোন ইঙ্গিত নেই !

ঃ সুতরাং···?

ঃ কিন্তু ওকে এখানে কে হত্যা করতে চাইবে ? ওর হাতঘড়ি, মানিব্যাগ পর্যন্ত খোয়া যায়নি !

ঃ রমেন গুহ দারোগা ছিল। যেখান থেকে ও বদলি হয়ে এসেছে সেখানকার কোর্টে এমন দশ-বিশটা কেসে হয় তো তাকে সাক্ষী দিতে যেতে হত। অন্তত একডজন আসামী খুশি হবে লোকটা বেমক্কা মারা গেল, নয় ? তাদের মধ্যে অন্তত আধডজন পাকা ক্রিমিনাল ! খুনী-ডাকাত-ওয়াগনব্রেকার-ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার ! তাদের মধ্যে কেউ—

ঃ কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ ওর রুদ্ধদ্বার ঘরে মদের পাত্রে বিষ মিশিয়ে দেবার সুযোগ পাবে কেমন করে ? রমেন কাল বেলা বারোটায় হোটেলে ঢুকেছে, সাড়ে বারোটায় ঘরে তালা মেরে বেরিয়ে গেছে। ফিরেছে রাত দশটায় ! এর মধ্যে তার ঘরে কেউ ঢোকেনি।

ঃ য়ু থিংক সো ?

ঃ নিশ্চয় ! আপনি হয় তো জানেন না, ও তার ঘরের দুটো চাবিই চেয়ে নিয়েছিল।

ঃ জানি। কিন্তু কেন ? দুটো চাবি নিয়ে সে কি করবে ? সে তো একা মানুষ !

নৃপেন একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে, আমি জানি না।

ঃ আই সী ! জানেন না !

আবার রুখে ওঠে নৃপেন, কেন, আপনি জানেন ?

ঃ জানি। কিন্তু ও কথা থাক। তার আগে বলুন তো—বীর বাহাদুর ঠিক ক'টার সময় গরম জল ভর্তি ফ্লাস্কটা ওর ঘরে রেখে আসে ?

নৃপেন আবার অস্বোয়াস্তি বোধ করে। বলে, আমি জানি না।

ঃ আই সী! জানেন না! সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। আমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিলাম। রমেন যখন সাড়ে বারোটার সময় বেরিয়ে যায় তখনই বলে যায়, তার ঘরে যেন এক ফ্লাস্ক গরম জল রেখে দেওয়া হয়। ফ্লাস্কটা তার নিজের। এখন বলুন তো, দুটো চাবিই যখন রমেনের কাছে তখন বীর বাহাদুর কেমন করে ও-ঘরে ঢুকল?

এ সমস্যা অনায়াসে সমাধান করে নৃপেন। বলে, জানি, ঐ মাস্টার-কী দিয়ে।

ঃ ও! জানেন! তাহলে আপনার ঐ আগেকার স্টেটমেণ্টটা তো ঠিক নয়। ঐ যে বললেন—বেলা সাড়ে বারোটা থেকে রাত দশটার মধ্যে ও-ঘরে কেউ ঢোকেনি!

নৃপেন অসহিষ্ণুর মত বলে ওঠে, কী আশ্চর্য! বীর বাহাদুর কেন বিষ মেশাবে? সে এ হোটেলে বিশ বছর চাকরি করছে—তার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

ঃ কারেক্ট! কিন্তু বীর বাহাদুর তার মাস্টার-কী দিয়ে যখন ঘরটা খুলেছিল তখন আর কেউ কি ঐ ঘরে ঢুকেছিল তার সঙ্গে?

নৃপেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। এ-জাতীয় অনুসন্ধান সে করেনি।

বাসু-সাহেব নিজে থেকেই বলেন, ঢোকেনি। আমি বীর বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। সে তালা খুলে একাই ঘরে ঢোকে। ফ্লাস্কটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে আসে। ঘরটা আবার তালাবন্ধ করে। পুরো এক মিনিট'ও সে ছিল না ঐ ঘরে। সুতরাং আর কেউ কোন সুযোগই পায়নি।

ঃ তার মানে আপনি বলতে চান, বীর বাহাদুরই একমাত্র সন্দেহজনক ব্যক্তি?

ঃ আমি মোটেই তা বলছি না। কারণ আমার কাছে এভিডেন্স আছে—বীর বাহাদুর ছাড়াও অন্তত দু'জন ঐ ঘরে ঢুকবার সুযোগ

পেয়েছিল, গতকাল বেলা বারোটার পরে এবং আজ সকাল ছ'টার আগে।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় নৃপেনের। বলে, কী বলছেন! দু'জন ঐ ঘরে ঢুকেছিল?

ঃ ডিড আই সে দ্যাট? আমি বলেছি ঢুকবার সুযোগ পেয়েছিল।

ঃ অর্থাৎ তারা যে ঢুকেছিল তার প্রমাণ নেই?

ঃ আছে! একজন যে ঢুকেছিল তার একটা প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়জনও খুব সম্ভবত ঢুকেছিল। কনক্লুসিভ প্রুফ্ নেই, কিন্তু অত্যন্ত জোরালো যুক্তি আছে।

নৃপেন বুঝতে পারে এ ভদ্রলোক সহজ মানুষ নন। উনি অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন, বুঝে ফেলেছেন। চোখ তুলে দেখে মিসেস্ বাসু কখন অলক্ষ্যে চলে গেছেন ঘর ছেড়ে, পিছনের বারান্দায়। সাগ্রহে সে বলে, বলুন স্যার, কী প্রমাণ পেয়েছেন! বাই দ্য ওয়ে, রমেন গুহকে আপনি কেমন করে চিনলেন?

ঃ আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা আপাতত মুলতুবি থাক। প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিই। একটা অনুমান, একটা প্রমাণ। অনুমানের কথাটাই আগে বলি। মহেন্দ্র আমার কাছে স্বীকার করেছে যে গতকাল রাত সাতটা নাগাদ বাইশ-নম্বর ঘরের বোর্ডার মহম্মদ ইব্রাহিম এসে তাকে বলে যে, তার ঘরের চাবিটা ঘরের ভেতর থাকা অবস্থায় সে ভুল করে ইয়েল-লক-ওয়ালা দরজাটা বন্ধ করে ফেলেছে। মহেন্দ্র তখন ওকে মাস্টার-কীটা দেয়। ইব্রাহিম মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে চাবিটা ফেরত দেয়। ফলো?

ঃ ইয়েস।

ঃ এনি কোশ্চেন?

ঃ কোশ্চেন! না কোশ্চেন কিসের?

ঃ তাহলে আমিই প্রশ্ন করি! মহেন্দ্র মাস্টার-কীটা কেন দিল? কেন নয় ঐ বাইশ-নম্বর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা?

নৃপেন বলে, ওতো একই কথা।

: আজ্ঞে না মশাই! মোটেই এক কথা নয়! মহেন্দ্র আমার কাছে স্বীকার করেছে চেক-ইন করবার সময় রমেন যখন তার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয়, তখন ইব্রাহিমও তার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয়। একজনকে সেটা দিয়ে দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রে মহেন্দ্র সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি।

: সো হোয়াট? তাতে হ'লটা কী? ডুপ্লিকেট চাবিতেও বাইশ-নম্বর ঘর খোলা যায়, মাস্টার-কী'তেও খোলা যায়। ও তো একই ব্যাপার!

: না! ডুপ্লিকেট চাবিতে শুধু বাইশ নম্বর ঘরের দরজা খোলা যায়, আর মাস্টার-কী'তে দোতলার সব কটা ঘর খোলা যায়! ইব্রাহিম ঐ পাঁচ মিনিটের ভিতর তেইশ-নম্বর ঘরে ঢুকে থাকতে পারে। তার আধঘণ্টা আগে কিন্তু বীর বাহাদুর ফ্লাস্কটা রেখে গেছে। ফ্লাস্কটা খুলে তার ভিতর একটা ক্রিস্টাল ফেলে বেরিয়ে আসতে বিশ থেকে ত্রিশ সেকেণ্ড লাগার কথা।

নৃপেন জবাব দিতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে বলে, আশ্চর্য! মহেন্দ্র তো এসব কথা আমাকে বলেনি।

: আপনি প্রশ্ন করেননি তাই বলেনি। সে এখনও জানে না ব্যাপারটার ইমপ্লিকেশন। আপনার মত সেও বিশ্বাস করে ডুপ্লিকেট চাবি আর মাস্টার-কী একই কথা। ছুটোতেই বাইশ নম্বর ঘর খোলা যায়।

একটা ঢোক গিলে নৃপেন বলে, আর আপনার দ্বিতীয় অনুমানটা স্যার?

: দ্বিতীয়টা অনুমান নয়, আগেই বলেছি—সেটা এভিডেন্স! অকাট্য প্রমাণ। আসুন—

নৃপেনকে নিয়ে বাসু-সাহেব দ্বিতলে উঠে আসেন। তালা খুলে ছু'জনে ঐ তেইশ নম্বর ঘরে ঢুকে পড়েন। রমেন গুহ একইভাবে

পড়ে আছে। বাসু-সাহেব পকেট থেকে একটা লোহার সোন্না বার করলেন। এগিয়ে এলেন টেবিলটার কাছে। অতি সাবধানে সোন্না দিয়ে এ্যাসট্রের গর্ভ থেকে উদ্ধার করলেন একটি দগ্ধাবশিষ্ট ফিলটার টিপ্‌ট সিগারেটের স্ট্যাম্প। আগুনের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেমনভাবে শিককাবাব ভাজা হয় তেমনি ভাবে সোন্নাটা টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান। নৃপেন বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে থাকে। কী দেখছে তা সেই জানে।

: দেখলেন ?—প্রশ্ন করলেন বাসু-সাহেব।

নৃপেন আমতা আমতা করে বললে, হুঁ !

: কী দেখলেন ?

এবার নৃপেন বিরক্ত হয়ে বলে, কী আবার দেখব ? সিগারেটের স্টাম্প ! এ্যাসট্রের ভিতর আবার কি থাকবে ?

মাথা নাড়েন বাসু-সাহেব। বলেন,থাকে দারোগা-সাহেব, থাকে ! চোখ থাকলে দেখবেন এ্যাসট্রের খোপে সিগারেটের স্টাম্পের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে একটি অভিসারিকা ! তার নয়নে মদির কটাক্ষ, সর্বাঙ্গে উদগ্র যৌবন, বিম্বোষ্ঠে লিপ্‌স্টিক—বোধকরি ম্যাক্সফ্যাকটার-ভার্মিলিয়ান !

নৃপেনের সন্দেহ জাগে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কি মাথায় দু-একটা স্ক্রু আলগা ! নাকি এই সাত-সকালেই মদ্যপান করেছেন ? কিন্তু এতক্ষণ তো ওঁকে প্রতিভাবান গোয়েন্দার মত মনে হচ্ছিল।

বাসু-সাহেব নৃপেনের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। ওর বিহ্বল অবস্থাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। আবার মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, একটা কথা খোলাখুলি বলব দারোগা-সাহেব ?

: বলুন স্যার !

: আপনার কম্মো নয় !

মিসেস ডি. সি-র মামা ! কী বলতে পারে নৃপেন ? একজন সিনিয়ার আই. এ. এস যাঁকে মামা ডাকেন তাঁর অধিকার আছে এ

কথা বলার। সংবিধানের কত নম্বর ধারায় ওটা বলা আছে নৃপেন তা ঠিক জানে না, কিন্তু এটুকু মনে আছে—কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবার সময় এ্যাব্রিভিয়েশান মুখস্ত করেছিল : I.A.S. শব্দের বিস্তারিতরূপ In Anticipation of Sword! অর্থাৎ এমন একটি শাসকগোষ্ঠী যাঁদের তরোয়ালের প্রয়োজন নেই—যাঁরা হাতে-মাপা-কাটেন! বিপুল ঘোষ সেই আই. এ. এস-গোষ্ঠীর একজন সিনিয়ার অফিসার—দুদিন পরেই হয়তো ডিভিশনাল কমিশনার হবেন। এ ভদ্রলোক হচ্ছেন তাঁর বেটার হাফের মামা!

নৃপেন ঢোক গেলে!

বাসু-সাহেব ওর পিঠে একখানা হাত রেখে বলেন, দুঃখ করবেন না মিস্টার ঘোষাল। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ক্রিমিনোলজি ইজ এ সায়েন্স! দারোগা মানেই ডিটেকটিভ নয়! আপনাদের আই. জি. ও এ ভুল করতে পারেন, যদি না তিনি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনে বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে থাকেন। আমার পরামর্শ শুনুন—এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন লোক জানা আছে আপনার? থাকলে তাকেই পাঠান। কেসটা ঘোরালো! এসব কথা তো আর আমি বিপুলকে জানাতে যাচ্ছি না!

নৃপেন মনস্থির করে। একেবারে আত্মসমর্পণ। বলে, অমন লোক আমার কাছেই আছে স্যার। আমার সেকেণ্ড অফিসার সুবীর রায়। আজই তার কার্শিয়াঙ থেকে ফিরে আসার কথা। তাকেই পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে—

: না, না আমার কাছে নয়। আমি শীঘ্রই এ হোটেল ছেড়ে চলে যাব।

: কেন স্যার? আর দু-একটা দিন—

: উপায় নেই ঘোষাল। আমি আজই চলে যাব অন্য একটা হোটেলে। ঘুম-এর কাছে। 'রিপোস'-এ। পশু তার উদ্বোধন। আমাদের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ আছে ওখানে।

উনি যে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরেছেন এতে খুশিই হল নৃপেন। বললে, কিন্তু ঐ 'ম্যাক্সফ্যাকটার ভার্মিলিয়ান' না কি যেন বললেন, ওটা কি? সিগারেটের স্টাম্পে কি দেখতে পেলেন আপনি?

ঃ প্রমাণ! এভিডেন্স! গতকাল রাত্রে এঘরে একজন অভিসারিকা প্রবেশ করেছিলেন। দেখছ না? টেবিল-এর উপর পড়ে রয়েছে রমেনের সিগারেটের প্যাকেট। ক্যাপ্‌স্টান! এটা ফিলটার-টিপ্‌ স্টাম্প! রমেন যখন ঘরটা ভাড়া নেয় তখন এ এ্যাসট্রেটা নিশ্চয় শূন্যগর্ভ ছিল। সে ক্যাপ্‌স্টান খেয়েছে। তাহলে এ্যাসট্রেতে ফিলটার টিপ সিগারেটের স্টাম্প আসে কেমন করে? তাছাড়া এই লাল স্পটটা? ওটা লিপস্টিকের চিহ্ন। ফরেনসিক এক্সপার্ট করোবরেট করবে—তুমি দেখে নিও। আর এই সূত্রেই বোঝা যাচ্ছে কেন রমেন গুহ দুটো চাবিই চেয়ে নেয়, কেন সে কিছুতেই রাজী হয়নি তোমার বাড়িতে রাত্রিবাস করতে!

নৃপেনের এখনও একবাঁও মেলে না।

ঃ বুঝলে না? রমেন কিছু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ছিল না। মিস্ ডিক্রুজা ছিল কলগার্ল। রমেনের সঙ্গে তার ভালই আলাপ হয়েছিল ট্যাক্সিতে আসার পথে। ডুপ্লিকেট চাবিটা রমেন দিয়ে রেখেছিল ঐ মিস্ ডিক্রুজাকে। বিশ্বাস না হয় মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—মিস্ ডিক্রুজা কাল সন্ধ্যাবেলায় যে লিপস্টিক ব্যবহার করেছিলেন সেটা ভার্মিলিয়ান রেড!

নৃপেন বলে, এখানে আমার আর কিছু করণীয় আছে স্যার?

ঃ আছে। দুটো কাজ। প্রথমত তেইশ নম্বর ঘরে যে ফ্লাক্সটা আছে ওটাও এভিডেন্স হিসাবে নিয়ে যাও। তবে এবার আর ভুল কর না। সাক্ষী রেখে ওটা সীল করিয়ে নিও। আমার অনুমান ঐ জলেও পটাসিয়াম সায়ানাইড পাওয়া যাবে। দু-নম্বর কাজ—ঐ তেইশ-নম্বর ঘরের দু-পাশের দুটি ঘর সার্চ করা। বাইশ নম্বরে ছিল ইব্রাহিম আর চব্বিশে মিস ডিক্রুজা। দুজনেই সন্দেহভাজন।

নৃপেন বলে, ইব্রাহিম তো রাত সাড়ে আটটার সময় চেক-আউট করে বেরিয়ে যায়। তখন তো রমেন গুহ জীবিত।

: আহ্! তুমি বড় জ্বালাও! বললাম না তোমাকে? রাত সাড়ে আটটায় সে হোটেল ত্যাগ করে বটে, কিন্তু রাত সাতটায় সে মাস্টার-কী নিয়ে দোতলায় উঠে গিয়েছিল। সে সময় ফ্লাস্কটা রাখা ছিল রমেনের টেবিলে।

: আয়াম সরি! ঠিক কথা! আচ্ছা, ঐ দুটো ঘরই সার্চ করছি আমি; কিন্তু আপনিও সঙ্গে থাকলে ভাল হত না?

: না! আমরা দার্জিলিঙে এসেছি বেড়াতে। আমার স্ত্রী অনেকক্ষণ একা বসে আছেন নিচের ঘরে। ওঁর কাছেই আমি ফিরে যাব এখন। তুমি বরং যাবার আগে আমাকে জানিয়ে যেও ঐ দুটো ঘরে উল্লেখ-যোগ্য কিছু পেলে কি না।

বাসু-সাহেব নেমে এলেন একতলায়। নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলেন ওঁর স্ত্রী রাণী দেবী চুপ করে বসে আছেন চাকা-দেওয়া চেয়ারে। কোলের উপর পড়ে আছে কণ্টকবিদীর্ণ অসমাপ্ত উলের সোয়েটারখানা। উলের গুলিটা পোষমানা বেড়ালছানার মত হাত পা গুটিয়ে বসে আছে ওঁর পায়ের কাছে। বিষাদের মূর্তি যেন!

: অনেকক্ষণ একা একা বসে আছো? নয়?

রাণী দেবীর চমক ভাঙে। ম্লান হেসে বলেন, দারোগাবাবা বিদায় হল?

: আপাতত। আবার আসবেন যাবার আগে।

: আমরা কখন 'রিপোস' এ যাচ্ছি?

: হয় আজ বিকালে, নয় কাল সকালে।

: তুমি বরং আগে একবার হোটেলটা দেখে এস। একেবারে দোর পর্যন্ত ট্যাক্সি যদি না যায়—

বাক্যটা উনি শেষ করেন না। প্রয়োজন ছিল না। ওঁরা দুজনেই জানেন মিসেস্ বাসু চলতশক্তিহীনা। একটা মারাত্মক এ্যাকসিডেন্টে

রাণী দেবীর পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। উনি খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারেন না। বস্তুত ঐ দুর্ঘটনার পর থেকেই বাসু-সাহেবের জীবন অন্য খাতে বইছে। প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন। এখন ওঁর একমাত্র কাজ পঙ্গু স্ত্রীকে সঙ্গদান করা। সন্তান একটিমাত্রই হয়েছিল ওঁদের। ঐ দুর্ঘটনায় মারা যায়।

বাসু-সাহেব হেসে বলেন, খবর নিয়েছি। গাড়ি যাবার রাস্তা আছে। না থাকলেও বাধা ছিল না। তোমাকে কোলপাঁজা করে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার আজও আছে। বিশ্বাস না হয় তো বল এখনই পরখ করে দেখাই।

এত দুঃখেও হেসে ফেলেন রাণী দেবী।

প্রায় মিনিট পনের পরে ফিরে এল নৃপেন। যথারীতি দরজায় নক্ করে ঢুকল ঘরে। বললে, মিস ডিক্রুজার ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না স্যার; কিন্তু মহম্মদ ইব্রাহিমের ঘরে একটা জিনিস উদ্ধার করেছি। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু দেখুন তো স্যার—

একটা কাগজের দলা। সেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, কোথায় পেলে এটা?

: বাইশ নম্বর ঘরে, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে।

: কাল রাত্রে ইব্রাহিম ঘরটা ছেড়ে যাবার পর ও-ঘরে নতুন বোর্ডার আসেনি?

: না। তবে শুনলাম এখনই আসবে। একুশ নম্বর ঘরের বোর্ডার নাকি ঐ ঘরে শিফ্‌ট্ করছেন!

চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বাসু-সাহেব। কাগজটা ওঁর মুঠিতে ধরাই থাকে। বলেন, কে ঐ একুশ নম্বরের বোর্ডার?

: নামটা জিজ্ঞাসা করিনি। তবে শুনলাম তিনি আর্টিস্ট। একুশ নম্বর ঘরের জানালা থেকে নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা ভাল দেখা যায় না, গাছের আড়াল পড়ে। তাই উনি বাইশ নম্বরে সরে আসতে চান। একটু আগে ঘরটা দেখে পছন্দ করে গেছেন। এখনই শিফ্‌ট্ করবেন।

: বুঝলাম। ধীরে ধীরে কোঁকড়ানো কাগজের দলাটা খুলে ফেলেন। কাগজটা মেলে ধরেন টেবিলের উপর। হঠাৎ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন বাসু-সাহেব। চোখ দু'টি বুঁজে যায়। রাণী দেবী ছিলেন পিছনেই। কৌতূহল দমন করতে পারেন না তিনি। ঝুঁকে পড়েন কাগজটার উপর। তাতে কালো কালিতে লেখা ছিল :

এক : দ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেল, দার্জিলিঙ

দুই : দ্য রিপোস্, বাতাসিয়া লুপ, ঘুম

তিন : ?

॥ তিন ॥

১লা অক্টোবর, মঙ্গলবার, ১৯৬৮।

দার্জিলিঙ-এর আগের স্টেশন, ঘুম। পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলস্টেশন। দার্জিলিঙ স্টেশনের চেয়েও তার উচ্চতা বেশী। ঘুমের অদূরে ঐ খেলাঘরের রেললাইনটা জিলাপীর প্যাঁচের মত বার দুই পাক খেয়েছে—তার নাম বাতাসিয়া ডবল্-লুপ। তারই পাশ দিয়ে একটা পাকা সড়ক উঠে গেছে উপর দিকে—ও পথে যেতে পারে ক্যাভেণ্টার্স অথবা কাঞ্চন ডেয়ারিতে কিম্বা 'টাইগার হিল'-এ। এই সড়কের উপরেই প্রকাণ্ড হাতা-ওয়ালা একটা বাড়ি। এককালে ছিল কোন চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিকের আবাসস্থল। বর্তমান এটাই 'দ্য

রিপোস' হোটেল। না, কথাটা ঠিক হল না—আজ নয়, আগামী-কাল থেকে সেটা হবে রিপোস হোটেল। আগামীকাল দোশরা তার উদ্বোধন।

মালিক শ্রীমতী সুজাতা মিত্র। সুজাতা বিবাহিতা—স্বামী কৌশিক মিত্র। শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বি-ই। সিভিল এঞ্জিনিয়ার। সুজাতার বাবা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। তিনি কী একটা আবিষ্কার করেছিলেন বলে শোনা যায়। সেই আবিষ্কারের পেটেন্টটা স্বনামে নেবার আগেই সন্দেহজনক ভাবে আকস্মিক মৃত্যু হয়েছিল ভদ্রলোকের। আবিষ্কারের সেই রিসার্চ-পেপারগুলো নিয়ে সুজাতা রীতিমত বিপদের ভিতর জড়িয়ে পড়ে। এমন কি শেষ পর্যন্ত এক খুনের মামলায়। রিসার্চের কাগজগুলো হাত করতে চেয়েছিলেন একজন কুখ্যাত ধনকুবের—ময়ূরকেতন আগরওয়াল। তিনিই ঘটনাচক্রে খুন হন। কৌশিক এবং সুজাতা বিশ্রী ভাবে জড়িয়ে পড়ে সেই খুনের মামলায়। বস্তুত ব্যারিষ্টার পি. কে বাসু এবং এ্যাডভোকেট অরূপরতনের যৌথ চেষ্টায় ওঁরা দুজনেই মুক্তি পায়। এর মধ্যে বাসু-সাহেবের ভূমিকাটাই ছিল মুখ্য। যাই হোক শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হল আগরওয়ালের হত্যাকারীর নাম—নকুল হুই। সে ছিল আগরওয়ালেরই অধীনস্থ কর্মচারী এবং নানান পাপ-কারবারের সাথী। সে-সব অতীতের ইতিহাস। 'নাগচম্পা' উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন অথবা 'যদি জানতেম' ছায়াছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে এসব কথা অজানা নয়।

মোটকথা ইতিমধ্যে সুজাতার সঙ্গে কৌশিকের বিয়ে হয়েছে বছরখানেক আগে। এখনও ঠিক এক বছর হয়নি। আগামী ৫ই অক্টোবর, শনিবারে ওদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী। বিয়ের পরে কৌশিক ডঃ চ্যাটার্জির ঐ আবিষ্কারটা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে চায়; কিন্তু সুজাতা রাজী হতে পারেনি। ঐ সর্বনাশা আবিষ্কারটা তার কাছে কেমন যেন অভিশপ্ত মনে হয়েছিল। তিন-

তিনজন লোকের মৃত্যু ঐ আবিষ্কারটার সঙ্গে জড়িত। প্রথমত ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যু, দ্বিতীয়ত গুলিবিদ্ধ হয়ে ময়ূরকেতন আগরওয়ালের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড এবং তৃতীয়ত হত্যাকারী নকুল হুই-এর ফাঁসি। হ্যাঁ—আগরওয়ালের হত্যাকারী নকুল হুইকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়। নকুল চেষ্টার ত্রুটি করেনি—সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত লড়েছিল—কিন্তু লোয়ার কোর্টের বিচার তিলমাত্র নড়েনি। অর্থলোভে সুপরিকল্পিতভাবে নকুল যে হত্যাকাণ্ডটা করেছিল তারজন্য বিচারক চরমতম দণ্ডই বহাল রেখেছিলেন।

তাই কেমন একটা অবসাদ এসেছিল সুজাতার। ঐ রিসার্চের কাগজগুলো থেকে সে মুক্তি চেয়েছিল। নিজের কুমারী জীবনের ঐ অভিশাপকে বিবাহিত-জীবনে টেনে আনতে চায়নি। কৌশিক এঞ্জিনিয়ার। এসব ভাবালুতার প্রশ্রয় সে প্রথমটা দিতে চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও মেনে নিয়েছিল। ফলে নগদ দেড় লক্ষ টাকায় ঐ পেটেন্টটা ওরা বিক্রয় করে দিয়েছিল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জীমূতবাহন মহাপাত্রের কাছে। জীমূতবাহন হচ্ছেন অরূপরতনের পিতৃদেব। হয়তো অরূপের প্রতি কৃতজ্ঞতাও এ সিদ্ধান্তের পিছনে কাজ করে থাকবে।

সুজাতা তার সদ্য-বিবাহিত স্বামীকে বলেছিল, ঐ নগদ দেড়লাখ টাকা নিয়ে এবার তুমি ঠিকাদারী ব্যবসা শুরু কর।

কৌশিক হেসে বলেছিল, তুমি যেমন ঐ রিসার্চ পেপারগুলো থেকে মুক্তি চাইছিলে সুজাতা, আমিও তেমনি আমার ঐ ডিগ্রিটা থেকে মুক্তি চাইছি আজ। আমি ভুলে যেতে চাই যে, আমি একজন সিভিল এঞ্জিনিয়ার!

সুজাতা অবাক হয়ে বলেছিল, ও আবার কি কথা? কেন?

ঃ ভারতবর্ষে এঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন নেই। এদেশে এঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার অথবা কারিগরী কাজ-জানা মানুষের আর কোন

দরকার নেই ! এদেশের প্রয়োজন এখন শুধু রাজনীতিবিদ, ব্যারিস্টার আর আই. এ এস এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের !

: হঠাৎ তোমার এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ?

: দেখতে পাচ্ছ না দেশের হাল। ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার-বৈজ্ঞানিকেরা এ দেশে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। দলে দলে দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ইহুদি হওয়ার অপরাধে নাৎসী জার্মানী যেমন আইনস্টাইনকে দেশত্যাগী করেছিল, বৈজ্ঞানিক হওয়ার অপরাধে আজ তেমনি প্রফেসর খোরানাকে ভারতবর্ষ দেশছাড়া করেছে !

সুজাতা হেসে বলে, এ তোমার রাগের কথা। খোরানা নোবেল প্রাইজ পাবার পর তাঁকে পদ্মবিভূষণ খেতাব দেওয়া হয়েছে !

হো-হো করে হেসে উঠেছিল কৌশিক। বলেছিল, ভাগ্যে প্রফেসর খোরানা শিশির ভাদুড়ী কিংবা উৎপল দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি !

: তুমি কী বলতে চাইছ বলত ?

: আমি বলতে চাইছি ম্যাট্রিকে আমি তিনটে লেটার পেয়েছিলাম, স্টার পেয়েছিলাম বি. ই-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। আমাদের স্কুল-ব্যাচের প্রত্যেকটি ভাল ছেলে ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার অথবা বৈজ্ঞানিক হতে চেয়েছে। যারা ঐ সব কলেজে ঢুকতে পারেনি সেই সব ঝড়তি-পড়তি মালই গেছে জেনারেল লাইনে। তাদের একটা ভগ্নাংশ আজ আই. এ.এস. আর একটা ভগ্নাংশ আজ এম.এল.এ !

সুজাতা তর্ক করেছিল। বলেছিল—তা তুমিও আই এ এস পরীক্ষা দিলে পারতে ? তুমিও ইলেকসানে দাঁড়াতে পারতে !

কৌশিক বিচিত্র হেসে বলেছিল, তুমিও যে মন্ত্রীদের মত কথা বলছ সুজাতা ! ছয় বছরের পাঠক্রম শেষ করে আই. এ. এস পরীক্ষা না দিলে আমার ঠাঁই হবে না এ পোড়া ভারতবর্ষে ? কিন্তু মুরারী মুখার্জির মত একজন সার্জেন, বি.সি. গাঙ্গুলির মত একজন এঞ্জিনিয়ার

অথবা খোরানার মত একজন বৈজ্ঞানিক যতদিন ফিনান্স কমিশনার, অথবা চীফ সেক্রেটারী হতে না চাইছেন—

অসহিষ্ণু হয়ে সুজাতা বলে উঠেছিল, মোদ্দা কথাটা কি? তুমি কী করতে চাও? ঐ দেড় লাখ টাকা ফিক্সড-ডিপোজিটে রেখে তার সুদের টাকায় আমরা গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াব?

: না! ব্যবসাই করতে চাই আমি—

: আমিও তো তাই বলছি। ব্যবসাই যদি করতে হয় তবে যে জিনিসটা জান, বোঝ, তার ব্যবসাই করা উচিত। আমি তো তোমাকে চাকরি করতে বলছি না; আমি বলছি ঠিকাদারী করতে—

: কোথায়? পি. ডাব্‌লু. ডি, ইরিগেশান অথবা কোনও পাবলিক আণ্ডারটেকিং-এ তো? সর্বত্রই তো ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদল শীর্ষ-স্থান দখল করে বসে আছেন। তাঁদের তৈলাক্ত করতে না পারলে—

: তবে কিসের ব্যবসা করবে তুমি?

: যে কোন স্বাধীন ব্যবসা। যাতে কাউকে তোষামোদ করতে হবে না। আর সেটা এমন একটা ব্যবসা হবে যেখানে তুমি-আমি দুজনেই খাটব। ইকোয়াল পার্টনার!
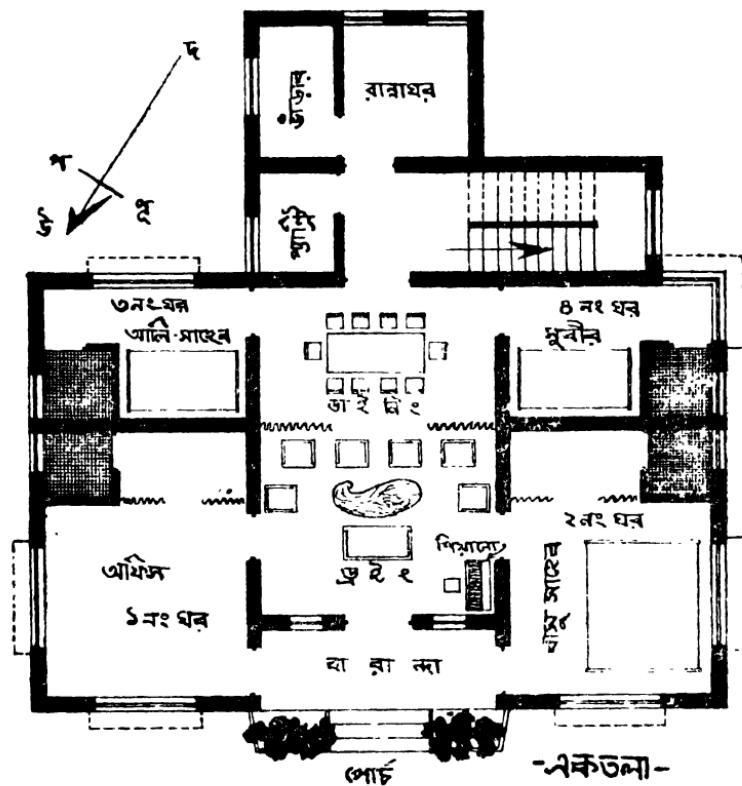
: যেমন?

: ধর, আমরা একটা হোটেল খুলতে পারি। তুমি কিচেন-এর ইনচার্জ। কী রঙের পর্দা হবে, কী জাতের বেড-কভার হবে সব তোমার হেপাজতে। আর আমি রাখব হিসাব, ম্যানেজমেণ্ট! সারা-দিন দুজনে কাছাকাছি থেকে কাজ করব। সকালবেলা দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ঠিকাদারী করতে বেরিয়ে যাব, আর রাত দশটায় ক্লান্ত শরীরে ফিরে আসব, তার চেয়ে এটা ভাল নয়?

কথাটা মনে ধরেছিল সুজাতার।

তারই ফলশ্রুতি এই 'দ্য রিপোস'!

জমি-বাড়ি-ফার্নিচার, ফ্রিজ, কিচেন-গ্যাজেট এবং একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি কিনতেই খরচ হয়ে গেল লাখ-খানেক টাকা। বাকি
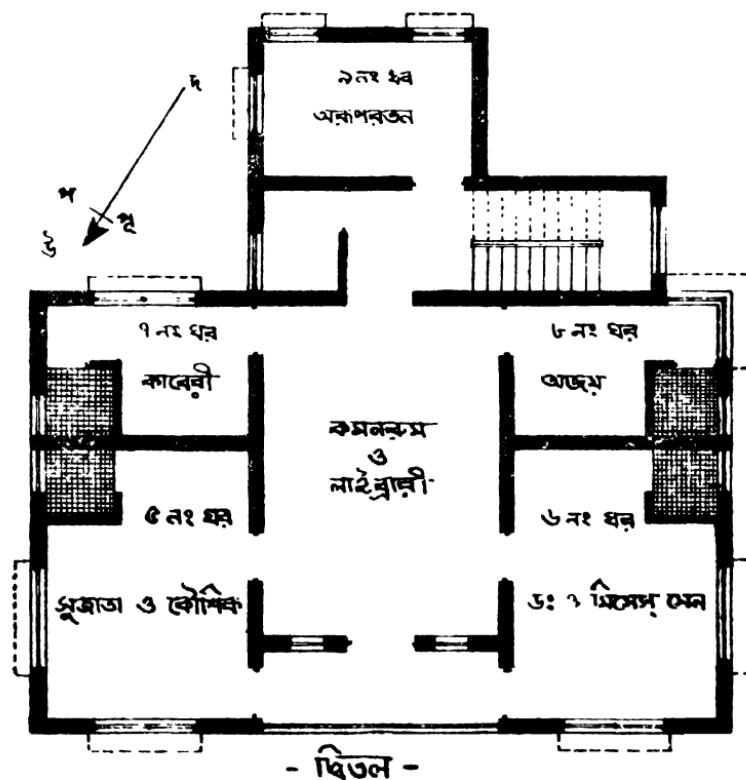
টাকা ব্যাঙ্কে রেখে ওরা দুজনে খুলে বসেছে হোটেল বিজনেস। বাড়িটা দোতলা। চারটে ডবল্-বেড বড় ঘর এবং দুটি সিংগল্-বেড। এ-ছাড়া একতলায় বেশ বড় একটা ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম। কিচেন ব্লক, প্যান্ট্রি, স্টোর ইত্যাদি। রীতিমত বিলাতী কায়দায় প্ল্যানিং। প্রায় প্রতিটি ঘরের সঙ্গেই সংলগ্ন স্নানাগার। কৌশিক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটার মেরামতি করিয়েছে। গরম-জলের গীসার বসিয়েছে। সুজাতা ম্যাচকরা পর্দা, বেড-কভার ইত্যাদি কিনেছে।

আয়োজন সম্পূর্ণ। আগামীকাল 'রিপোস'-এর উদ্বোধন। গোটা ছয়েক বিজ্ঞাপন মাত্র ছাড়া হয়েছে। দুজন সে বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছেন। আশা করা যায় পূজা মরশুমে ঘর খালি পড়ে থাকবে না। দার্জিলিঙ-এর হৈ চৈ এড়িয়ে নিরিবিলিতে ছুটির ক'টা দিন কাটিয়ে

যেতে ইচ্ছুক যাত্রী নিশ্চয় জুটবে। যে দুজন বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। দুজনেই কলকাতা-বাসী। মিস্টার নিজামুদ্দিন আলি এবং মিস্ কাবেরী দত্তগুপ্তা। দুজনেই জানিয়েছেন বুধবার, ২রা দুপুরে ছোট রেলে ঘুম স্টেশনে এসে পৌঁছাবেন। কৌশিক লিখেছিল স্টেশনেই ওঁদের রিসিভ করা হবে। উদ্বোধনের দিন, প্রথম বোর্ডার—তাই এই খাতির।

- দ্বিতল -

উদ্বোধনের আগের দিন। মঙ্গলবার। পয়লা। সকাল থেকেই কালিপদ আর কাঞ্চীকে নিয়ে সুজাতা শেষ বারের মত ঝাড়াপোঁছায় লেগেছে। কালিপদ মেদিনীপুরী—সমতলবাসী। চাকরির লোভে এসেছে এতদূর। রিপোস-এর একমাত্র বেহারা। আর কাঞ্চী হচ্ছে স্থানীয় নেপালী মেয়ে। সামনের গ্রামটায় থাকে।

দু-জন বোর্ডার এ্যাডভান্স পাঠিয়েছেন। এ-ছাড়াও আরও তিনজন আসছেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে। ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু সস্ত্রীক এবং এ্যাডভোকেট অরূপরতন। অরূপের জন্য দোতলার নয়-নম্বর ঘরটা ঠিক করা আছে, আর বাসু-সাহেবের জন্য একতলার দু-নম্বর ঘরটা। মিসেস্ বাসুর পক্ষে একতলা ছাড়া উপায় নেই। আলি-সাহেবের জন্য তিন নম্বর আর কাবেরীর জন্য দোতলার সাত-নম্বর ঘরটা মনে মনে স্থির করে রেখেছে সুজাতা। এখন ওঁদের পছন্দ হলে হয়।

বেলা দশটা নাগাদ কৌশিক গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল কাঞ্চন-ডেয়ারির দিকে। ওখান থেকে মাইল পাঁচেক। গাড়ি যাবার রাস্তা আছে। কাঞ্চন ডেয়ারির মালিক মিস্টার সেন ওদের পরিচিত। মিস্টার সেনের ভাইপো অজিত সেন কৌশিকের সহপাঠী। আপাতত ডজন-দুই-তিন ডিম, কিছু হ্যাম, সক্‌ট্‌মীট আর মাখন নিয়ে আসবে। আলি সাহেব হ্যাম খাবেন কি না জানা নেই। তাই দু-রকম মাংসের ব্যবস্থাই থাকল। ফ্রিজ আছে, নষ্ট হয়ে যাবার ভয় নেই। সুজাতা বলে দিয়েছে কাঞ্চন ডেয়ারির সঙ্গে যেন একটা অন-এ্যাকাউণ্ট ব্যবস্থা করে আসে। একদিন অন্তর কতটা কী মাল লাগবে তার ফিরিস্তিও লিখে দিয়েছে। আজ বিকালে সুজাতার একবার দার্জিলিঙে যাবার ইচ্ছে। কৌশিককে তাই বলে রেখেছে সকাল করে ফিরতে। কিছু টুকিটাকি বাজার এখনও বাকি আছে।

বাসু-সাহেব কাল দার্জিলিঙ থেকে ফোন করেছিলেন। সুজাতা অনুযোগ করেছিল—আবার দার্জিলিঙ গেলেন কেন? সরাসরি এখানে এসে উঠলেই পারতেন?

বাসু-সাহেব সকৌতুকে বলেছিলেন, নেমন্তন্নর গন্ধ পেয়ে আমি দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে যে আগেই এসে পৌছেছি।

: তাতে কি? আপনি তো ঘরের লোক! রাণু মাসীমাও এসেছেন তো?

: নিশ্চয়ই। তোমার 'রিপোস' পর্যন্ত ট্যাক্সি যাবে তো ?

: আসবে। আপনি এখনই চলে আসুন।

: না সুজাতা, কাল আসছি। লাঞ্চ-আওয়ার্সের পরে। ভাল কথা, রমেন গুহকে মনে আছে ? আমাদের নাট্যামোদী রমেন দারোগা ?

: খুব মনে আছে। কেন বলুন তো ?

: বিপুলের কাছে শুনলাম রমেন দার্জিলিঙে বদলি হয়েছে। কাল পর্শুর মধ্যেই আসছে।

: তবে তাঁকেও নিমন্ত্রণ করবে। আমার হয়ে। আমি থানায় ফোন করে খবর নেব। মিস্টার ঘোষ আর মিসেস্ ঘোষ কিছুক্ষণের জন্য আসবেন বলেছেন।

: জানি। কিন্তু বিপুল বোধহয় শেষপর্যন্ত তোমার নিমন্ত্রণ রাখতে পারবে না। শুনছি গভর্ণর-সাহেব স্বয়ং দার্জিলিঙ আসছেন। ফলে ডি.সি সাহেবের সব স্পোসাল-এ্যাপয়েন্টমেণ্ট ক্যানসেল হয়ে যেতে পারে

কালিপদ এসে দাঁড়ায়। জানতে চায়, বড ফুলদানিটা কোথায় থাকবে ?

সুজাতা স্মৃতিচারণ থেকে বর্তমানে ফিরে আসে। ওর হাত থেকে চিনেমাটির ফুলদানিটা নিয়ে আঁচল দিয়ে মোছে। বলে, একতলায় ড্রইংরুম, পিয়ানোটার উপর। কাল সকালে মনে করে ওতে ফুল দিবি। বুঝলি ?

: আজ্ঞে, আচ্ছা।

ঘড়ির দিকে নজর পড়ে। বেলা প্রায় দুটো। এতক্ষণে কৌশিকের ফিরে আসা উচিত ছিল। রান্নাবান্না সেই কখন হয়ে গেছে। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। সুজাতা আর অপেক্ষা করল না। কালিপদ আর কাঞ্চীকে খাইয়ে ছেড়ে দিল। কালিপদর ওবেলায় ছুটি। কোথায় বুঝি পাহাড়িদের রামলীলা হবে, তাই শুনতে যাবে। তা যাক।

সুজাতাও তো ওবেলায় দার্জিলিঙ যাবে। থাকবে না। হঠাৎ ঝন ঝন করে বেজে উঠ্‌ল টেলিফোনটা। কৌশিকই ফোন করছে।

সুজাতা প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার? এত দেরী হচ্ছে যে?

ঃ আরে বল না। গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছে। মেরামত করাচ্ছি। ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

ঃ তার মানে ওবেলা দার্জিলিঙ যাওয়ার প্রোগ্রাম ক্যানসেল?

ঃ উপায় কি বল! তুমি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নাও বরং।

ঃ তা তো বুঝলাম: কিন্তু তুমি কোথা থেকে কথা বলছ? দুপুরে খাবে কোথায়?

ঃ কাঞ্চন ডেয়ারি থেকে। সেন-সাহেবের অতিথি হয়েছি। বুঝলে? আমার জন্য অপেক্ষা কর না!

অগত্যা উপায় কি? সুজাতা একাই খেয়ে নিল। ক্রমে বেলা পড়ে এল। বিকালের দিকে কোথা থেকে আকাশে এসে জুটল কিছু উঠ্‌কো মেঘ। নামল বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগেই ঘনিয়ে এল অন্ধকার। কৌশিকের ফোনটা আসার আগেই কালিপদকে ছুটি দিয়ে বসে আছে। আগে জানলে কালিপদকে ছাড়ত না। কাঞ্চী রাত্রে থাকে না। নির্বান্ধব পুরীতে চুপচাপ বসে রইল সুজাতা। জানালা দিয়ে দেখতে থাকে কার্ট-রোড দিয়ে গাড়ির মিছিল চলেছে—উপর থেকে নিচে আর নিচ থেকে উপরে। বাতাসিয়া ডবল লুপ দিয়ে একটা মালগাড়ি পাক খেতে খেতে নেমে গেল।

ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। অন্যদিন হলে দার্জিলিঙ-এর আলোর রোশনাই দেখা যেত। পাহাড়ের এখানে-ওখানে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে রাতচরা বাতিগুলো তাকিয়ে থাকে। নিত্য দীপাবলীর রূপ-সজ্জা। আজ আকাশ আছে কালো করে। ঝির ঝির করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। আঞ্চলিক পাহাড়ে বৃষ্টি। হয়তো দার্জিলিঙ খটখটে, হয়তো কার্শিয়াঙ রৌদ্রজ্জ্বল—বৃষ্টি নেমেছে শুধু ঘুমের দেশে। এলো-মেলো ঝোড়ো হাওয়ার খ্যাপামি। সুজাতা সব দরজা-জানালা বন্ধ

করে দিয়ে এসে বসে। এমন রাতে আলো ফিউস্ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। সে কথা মনে হতেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে সুজাতার। এই নির্বান্ধব পুরীতে যদি অন্ধকারে তাকে একা বসে থাকতে হয়! তাড়াতাড়ি উঠে মোমবাতি আর দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে হাতের কাছে রাখে। টর্চটাও। কালিপদটার যেমন বুদ্ধি! ঝড় জলে রাম-লীলার আসর নিশ্চয় ভেঙে গেছে। হতভাগাটা বাড়ি ফিরে এলেই পারে। কিন্তু ওরই বা দোষ কি? হয়তো আশ্রয় নিয়েছে কারও গাড়ি-বারান্দার তলায়। বৃষ্টিটা একটু না ধরলে সে বেচারি আসেই বা কি করে! পাহাড়ে বৃষ্টি, থাকবে না বেশিক্ষণ। দার্জিলিঙের বৃষ্টি ঐ অজাযুদ্ধ-ঋষিশ্রাদ্ধের সগোত্র। আসতেও যেমন যেতেও তেমন। কিন্তু কই আজ তো তা হচ্ছে না। আবার নজর পড়ল দেওয়াল ঘড়িটার দিকে। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর সে সাড়া দেয়। জানিয়ে দিল রাত সাতটা। হঠাৎ বেজে উঠল আবার ফোনটা। গিয়ে ধরল সুজাতা: হ্যালো?

: রিপোস?

: হ্যাঁ, বলুন।

: আমি 'হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপ' থেকে বলছি। আপনাদের গাড়ি মেরামত হয়ে গেছে। লোক দিয়ে পৌঁছে দেব না কি মিস্টার মিত্র দার্জিলিঙ থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবেন?

: দার্জিলিঙ থেকে! উনি দার্জিলিঙ গেছেন কে বলল?

: বাঃ! দার্জিলিঙেই তো যাচ্ছিলেন উনি। গাড়ি থেমে যেতে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি ধরে চলে গেলেন।

: ও! তা কী বলে গেছেন উনি?

: বলেছেন তো উনি নিজেই নিয়ে যাবেন, তা রাত আটটার সময় আমার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে—

: আমার মনে হয় আটটার আগেই উনি ফিরবেন। নেহাৎ না ফেরেন দোকান বন্ধ করার সময় পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

লাইনটা কেটে দিয়ে সুজাতা ভাবতে বসে—ব্যাপার কি? কৌশিক যদি একটা শেয়ারের ট্যাক্সি নিয়ে দার্জিলিঙ গিয়ে থাকে তাহলে দু'পুরে সে টেলিফোন করে মিছে কথা বলল কেন? আর দার্জিলিঙ গেলে সে নিশ্চয় সুজাতাকেও নিয়ে যেত। সেই রকমই তো কথা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কি হতে পারে? 'হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপ'টা আবার ও-দিকে—মানে দার্জিলিঙ যাওয়ার পথেই পড়বে, কাঞ্চন ডেয়ারির দিকে নয়। তাহলে? কিন্তু কৌশিক তো স্পষ্ট বলল সে কাঞ্চন ডেয়ারি থেকে ফোন করছে, মিস্টার সেনের বাড়িতে দুপুরে খাবে! এমন অদ্ভুত আচরণ তো কৌশিক কখনও করেনি এর আগে। সুজাতা শেষ পর্যন্ত আর কৌতূহল দমন করতে পারে না। কৌশিক ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। উঠে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিল। কাঞ্চন ডেয়ারির মালিক মিস্টার সেনকে ফোন করল। ফোন ধরলেন সেন-সাহেব নিজেই। সুজাতা সরাসরি প্রশ্ন করল আজ তাঁর সঙ্গে কৌশিকের দেখা হয়েছে কি না। সেন-সাহেব জানালেন—হয়েছে, দার্জিলিঙে। তাঁর অফিসে। কৌশিক ডিম-মাখন-মাংস ইত্যাদি খরিদ করেছে তাঁর দার্জিলিঙ-এর দোকান থেকে। সপ্তাহে দু'দিন সাপ্লাই দিতেও তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন কৌশিকের সঙ্গে। তারপর সেন-সাহেবই প্রতিপ্রশ্ন করেন মিস্টার মিত্র কি এখনও ফিরে আসেনান?

: না। তাই তো খোঁজ নিচ্ছি। দার্জিলিঙে বৃষ্টি হয়েছে নাকি?

: আদৌ না। আমি তো এইমাত্র ফিরছি সেখান থেকে।

সুজাতা স্থির করল কৌশিক ফিরলে প্রথমেই সে সরাসরি জানতে চাইবে—কেন এমন অযথা মিথ্যা কথা বলল সে! আরও এক ঘণ্টা কাটল। রাত সওয়া নয়টা। না কৌশিক, না কালিপদ।

শেষ পর্যন্ত বাইরের পোর্চে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ হল। সুজাতা উঠে গেল সদর খুলে দিতে। এতক্ষণে আসা হল বাবুর! বেশ মানুষ যা হোক। হঠাৎ নজর হল—না, ওদের গাড়িটা

নয়। একটা ট্যাক্সি। গাড়ি থেকে একটা স্যুটকেশ আর একটা হাত-ব্যাগ নিয়ে একজন অচেনা ভদ্রলোক নেমে এলেন। ভদ্রলোক স্যুটের উপর বর্ষাতি চাপিয়েছেন। বৃষ্টি তখনও হচ্ছে। টর্চ জ্বেলে 'রিপোস'-এর সাইন বোর্ডটা দেখলেন। ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ট্যাক্সিটা ব্যাক করল। ভদ্রলোক কলিং বেলটা টিপে ধরলেন।

সুজাতার ভীষণ রাগ হচ্ছিল কৌশিকের উপর। কোনও মানে হয়। রাত সওয়া ন'টা। কি করবে সে এখন? লোকটা অচেনা—এই নির্বান্ধবপুরীতে সে একা মেয়েছেলে। ট্যাক্সিটাও চলে গেল!

দ্বিতীয়বার আর্তনাদ করে উঠল কলিং বেলটা।

উপায় নেই। দরজা খুলতেই হবে। তবে অনেক ঝড়-ঝাপটা এই বয়সেই সয়েছে সুজাতা। ভয় ডর এমনিতেই তার কম। অকুতো-ভয়ে সে দরজা খুলে মুখ বাড়ায়। ওকে দেখে একটু হকচাকিয়ে যান ভদ্রলোক। বলেন, মাপ করবেন, এটা 'রিপোস' হোটেল তো?

: হ্যাঁ। কাকে খুঁজছেন?

: ব্যক্তি খুঁজছি না, খুঁজছি বস্তু।

: বস্তু?

: আশ্রয়। আমার নাম এন. আলি—আমার রিজার্ভেসান আছে এখানে।

: ও আপনি! মিস্টার আলি! আসুন, আসুন—আপনার না আগামীকাল আসার কথা?

: কথা তাই ছিল। একদিন আগেই এসে পড়েছি বিশেষ কারণে। অসুবিধা হবে না আশা করি?

: অসুবিধা হবে। আমাদের নয়, আপনার। কিন্তু সে-কথা এখন চিন্তা করে লাভ নেই। এই বর্ষণমুখর রাত্রে আপনি আরাম খুঁজছেন না, খুঁজছেন আশ্রয়।

আলি-সাহেব পা-পোষে জুতোটা ঘষে ড্রইংরুমে প্রবেশ করেন। হেসে বলেন, বর্ষণমুখর রাত্রি! কথাটা কাব্যগন্ধী!

সুজাতা কথা ঘোরানোর জন্য বলে, ভিজে গেছেন নাকি ?

: বিশেষ নয়। ভাল কথা, আমার নামে যে ঘরটা বুক করা আছে, সেটা কি আজ এই 'বর্ষণমুখর রাত্রে' ফাঁকা আছে ?

সুজাতা একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করে। ঘুরিয়ে বলে, না-থাকলেও শোবার একটা ঘর পাবেন।

: তার মানে হোটেল আপনার 'উপচীয়মান'! পূজা মরশুম। তাই নয় ?

সুজাতা সত্যিকথাটা স্বীকার করবে কি না বুঝে উঠ্তে পারে না।

ভদ্রলোক ভিজা বর্ষাতিটা খুলে হ্যাট-র্যাকে টাঙিয়ে রাখেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, বেহারাদের কাউকে দেখছি না যে ?

: আসবে এখনই। কোথা থেকে আসছেন এত রাত্রে ?

: দার্জিলিঙ থেকে। আজই সকালে পৌঁছেছিলাম সেখানে।

: তাহলে এই রাত করে বার হলেন যে ? 'রিপোস' তো আপনি চিনতেনও না।

: দার্জিলিঙ ওভার-বুকড। কোনও হোটেলে ঠাঁই নেই। ভাবলাম আপনারা একটা-না-একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন। আচ্ছা, মিস্টার মিত্র কোথায় ? আমার চিঠির জবাব দিয়েছিলেন তো সাম-মিস্টার মিত্র।

: হ্যাঁ, কৌশিক মিত্র। আমি মিসেস মিত্র।

: আমি তা আগেই বুঝেছি। মিস্টার কৌশিক মিত্র কোথায় ?

: দোতলায়। অফিসে কাজ করছেন। আসুন, আপনার ঘরটা দেখিয়ে দিই—

আলি ইতস্তত করে। আশা করছিল কোন বেহারা এসে ওর ব্যাগটা নেবে।

সুজাতা বলে, স্যুটকেশটা এখানেই থাক। রুম-সার্ভিসের বেহারা পৌঁছে দেবে। আপনি শুধু হাত ব্যাগটা নিয়ে আসুন—

: প্রয়োজন হবে না। নিজের ব্যাগ আমি নিজেই বয়ে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত। ও-দেশে স্টেশনে-এয়ারপোর্টে এমন কুলির ব্যবস্থা নেই। নিজের মাল নিজেকেই বইতে হয়।

: আপনি বুঝি সদ্য বিদেশ থেকে ফিরেছেন? চলতে চলতে সুজাতা প্রশ্ন করে।

আলি সে কথা এড়িয়ে বলে, আমি কিন্তু এখন এক কাপ চা খাব মিসেস্ মিত্র। বিকালে চা জোটেনি।

এতক্ষণে মনে পড়ে গেল সুজাতার। বৈকালিক চা পান তার নিজেরও হয়নি।

ড্রইংরুম পার হয়ে পর্দা সরিয়ে ডাইনিং রুম। তার ও দিকে বাড়ির পশ্চিম-কোণার তিন নম্বর ঘরটিতে পৌছালো ওরা। (প্ল্যানে ভুলে পূব-পশ্চিম উল্টে গেছে) সুজাতাই আগে ঢুকল ঘরে। আলোর সুইচটা জ্বেলে দিতে। বললে, ওয়াশ-আপ করতে চান তো গীসারটা চালু করে দিন। মিনিট দশেকের মধ্যেই গরম জল পাবেন। আমি চা-টা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি। মিস্টার মিত্রকেও খবরটা দিই। সরুন—

আলি ঘরে ঢোকেনি। দাঁড়িয়ে ছিল দরজার মুখে। বস্তুত দরজা আগলে। হঠাৎ হাসি হাসি মুখে লোকটা বলল, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব মিসেস্ মিত্র?

একটু সচকিত হয়ে ওঠে সুজাতা। লোকটা অমন দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে কেন? তবু সাহস দেখিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে, বলুন?

: এমন 'বর্ষণমুখর রাত্রে' এই নির্বান্ধব বাড়িতে একেবারে একা থাকতে আপনার ভয় করে না?

হাত-পা হিম হয়ে গেল সুজাতার। মনে হল ওর পিঠের দিকে, ব্লাউজের ভিতর কি যেন একটা সরীসৃপ কিলবিল করে নেমে গেল।

কাট-রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। তাদের হেডলাইট বাঁকের মুখে

জমাটবাঁধা অন্ধকার-স্তূপে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। অন্ধকার তাতে একটুও কমছে না। গাড়ি বাঁক নিলেই আঁধারে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে দু'পাশের আদিম অরণ্য। তা হোক, তবু ঐ গাড়িগুলো মানব সভ্যতার প্রতিনিধি। ওর ভিতর আছে মানুষজন। সুজাতা একা নয়। কিন্তু কাট-রোড যে ওখান থেকে তিন-চারশ ফুট!

নিতান্ত ঘটনাচক্র। ঠিক এই মুহূর্তেই ড্রইংরুমে বেজে উঠল টেলিফোন। তার যান্ত্রিক কর্কশ শব্দটা জলতরঙ্গের মত মিঠে মনে হল সুজাতার কাছে। না, সে একা নয়। তাকে ঘিরে আসে এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের শুভেচ্ছা! ও তাদের সব্বাইকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু ঐ তো ওদেরই মধ্যে একজন যান্ত্রিক দূরভাষণে ওর কুশল জানতে চাইছে। দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে সুজাতা বললে আগেকার শব্দটাই, সরুন!

দরজা থেকে সরে দাঁড়াল আলি। সুজাতা ডাইনিংরুম পার হয়ে চলে এল ড্রইংরুমে। পিয়ানোটার পাশেই টেলিফোন স্ট্যাণ্ড। ড্রইং আর ডাইনিং রুম-এর মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পর্দা। বর্তমানে সরানো। তাই তিন-নম্বর ঘরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছিল আলি—শাড়ির আঁচল সামলিয়ে সুজাতা টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সাড়া দিলঃ 'রিপোস'!

দার্জিলিঙ থেকে মণি-বৌদি ফোন করছেন। ডি. সি. মিস্টার বিপুল ঘোষ, আই. এ. এস্-এর স্ত্রী। জানালেন—সুজাতার নিমন্ত্রণ রাখতে আসা সম্ভবপর হচ্ছে না ওঁদের পক্ষে। গভর্ণর দার্জিলিঙে আসছেন। ফলে ডি. সি. ব্যস্ত থাকবেন। তাছাড়া রেডিওতে নাকি খবর দিয়েছে সমস্ত উত্তরবঙ্গে আগামী দু'তিনদিন প্রবল বর্ষণ হতে পারে।

সুজাতা অপ্রয়োজনে দীর্ঘায়ত করল তার দূরভাষণ। নানান খেজুড়ে গল্প জুড়ে সময় কাটালো। লক্ষ্য করে আড়চোখে দেখল—আলি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে অনেকটা। সে এখন ড্রইং-

ডাইনিং রুম-এর সঙ্গমস্থলে। মুখ-হাত ধুতে ঘরে যায়নি। বরং পাইপটা জ্বেলেছে।

ঠিক এই সময়ই ফিরে এল কালিপদ। কাক ভেজা হয়ে। তাকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল সুজাতার। টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললে, জামাকাপড় ছেড়ে ফেল। চায়ের জল বসা।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আলি-সাহেবের। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই সুজাতা বলে ওঠে, মাপ করবেন, তখন কী যেন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি? টেলিফোনটা বেজে ওঠায় জবাব দেওয়া হয়নি।

আলি হেসে বললে, প্রশ্নটা এতক্ষণে তামাদি হয়ে গেছে!

: ভুলে গেছেন?

: যাব না? ডি, সি; ও, সি; গভর্ণর!···তারপর কি আর কিছু মনে থাকে?

নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেল আলি।

রাত দশটায় ফিরে এল কৌশিক। বৃষ্টিতে ভিজে। গাড়ির কেরিয়ারে খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে। অভিমান-ক্ষুব্ধা সুজাতা কোনও কৌতূহল দেখালো না। জানতে চাইল না কেন এত রাত হল। কৌশিক নিজে থেকেই সাতকাহন করে কৈফিয়ৎ দিতে থাকে। বেশ বোঝা গেল—'হিমালয়ান মোটর রিপেয়ারিং শপ-এর লোকটা কৌশিককে জানায়নি যে, ইতিমধ্যে সে 'রিপোস'-এ ফোন করেছিল।

রাত্রে খাবার টেবিলে কৌশিকের সঙ্গে পরিচয় হল আলি-সাহেবের। তিনজনে একসঙ্গেই খেতে বসেছিল। ডিনার টেবিলে। সেলফ-হেলফ পরিবেশন ব্যবস্থা। কৌশিক আলি-সাহেবকে বললে, আপনার নিশ্চয় খুব অসুবিধা হয়েছে। আমরা এখনও ঠিকমত প্রস্তুত নই, বুঝেছেন? আগামীকাল থেকে হোটেল চালু হবার কথা।

আলি-সাহেব আলুভাজার প্লেটটা নিজের দিকে টেনে নিতে নিতে বলে, বুঝেছি। তাই বুঝি গাড়ি নিয়ে শেষবারের মত বাজার করতে গিয়েছিলেন দার্জিলিঙে?

ঃ না, না, দার্জিলিঙে তো নয়। আমি গিয়েছিলাম কাঞ্চন ডেয়ারিতে। এদিকে—

ঃ ও, তাই বুঝি! আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম—আপনি বুঝি দোতলার অফিসঘরে বসে কাজ করছেন। মিসেস্ মিত্রই আমার ভুলটা ভেঙে দিলেন। বললেন—না, উনি বাড়িতে একেবারে একা আছেন। চাকরটা পর্যন্ত নেই! আর আপনি নাকি বাজার করতে দার্জিলিঙে গেছেন।

ঃ দার্জিলিঙ! তুমি তাই বলেছ?—কৌশিক প্রশ্ন করে সুজাতাকে।

সুজাতা সে প্রশ্নের জবাব দেয় না। আলি-সাহেবকে বলে, আজ কিন্তু সংক্ষিপ্ত মেনু। এই তিনটেই আইটেম—আলুভাজা, ডিমভাজা আর খিচুড়ি।

আলি হেসে বলে, আজ আকাশের যা অবস্থা তাতে অন্যরকম আয়োজন হলে আপনাকে বেরসিকা ভাবতাম মিসেস্ মিত্র!

কৌশিক বললে, সত্যি—কী বিশ্রী বৃষ্টি শুরু হল!

আলি বিচিত্র হেসে বললে, বিশ্রী! সেটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গির দোষ। বিরহকাতরা কোন বিরহিনী হয়তো এমন রাতেই গান ধরেন 'কৈসে গোঁয়াইবি হরিবিনে দিনরাতিয়া!' কি বলেন মিসেস মিত্র?

সুজাতা মুখ টিপে বলে, আপনাকে কাব্য যোগে ধরেছে মনে হচ্ছে!

ঃ ধরবে না? আমার কাছে রাতটা যে মোটেই বিশ্রী নয়—আমার বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে এটা বর্ষণমুখর রাত্রি!

কৌশিক সন্দিগ্ধভাবে দু'জনের দিকে তাকায়। তার হঠাৎ মনে

হয়—সুজাতা লজ্জা পেল। কেন? যেন কথা ঘোরাতেই সুজাতা বললে, মুশ্‌কিল হয়েছে কি আমার হেড কুক-এর প্রবল জ্বর হয়েছে!

: কার? কালিপদর? —কৌশিক জানতে চায়।

সুজাতা বলে, হ্যাঁ। বৃষ্টিতে ভিজে।

আলি বলে, তবে তো খুব মুশ্‌কিল হল আপনার। কাল সকালেই সব বোর্ডাররা আসবেন তো?

: সকালে না হয় সারাদিনে তো আসবেই।

: তাহলে লোকজন আসার আগে আপনাকে জনান্তিকে একটা খবর দিয়ে রাখি মিসেস্ মিত্র। আমি ব্যাচিলার—নিজের রান্না নিজে করি। পিকনিকে গেলে বরাবর আমাকে রাঁধতে হয়েছে। প্রয়োজনবোধে আপনার হেড কুকের এ্যাকটিনি করতে পারি। ভাটপাড়া অথবা নবদ্বীপ থেকে কোন পণ্ডিতমশাই নিশ্চয় আপনার বোর্ডার হতে আসছেন না?

কৌশিক তাড়াতাড়ি বলে, না না তার প্রয়োজন হবে না। আমিই তো আছি!

: এখন আছেন। কাল সকালেই হয়তো আবার দার্জিলিঙ ছুটবেন—আই মিন কাঞ্চন ডেয়ারিতে।

কৌশিক বিষম খেল।

॥ চার ॥

২রা অক্টোবর, বুধবার। সন্ধ্যা।

ইতিমধ্যে রিপোস-এ এসে হাজির হয়েছেন বেশ কয়েকজন। সুজাতা চোখে অন্ধকার দেখে। কাল রাত্রি থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তা থামার লক্ষণ নেই। এক নাগাড়ে বর্ষণ চলেছে। পাহাড়ে বৃষ্টি। কখন থামবে কেউ জানে না। রেডিওতে তো বলছে সহজে থামবে না। কালিপদ সেই যে শুয়েছে আর ওঠার নাম নেই। সারা

রাত প্রবল জ্বরে ছটফট করেছে বেচারি। ওদিকে কাঞ্চী আজ সকালে আসেনি—ওদের বস্তীর ঘরে হুড় হুড় করে জল ঢুকছে হয়তো। সেই সামলাতেই ওরা হিমসিম। অথচ এদিকে একে একে এসে উপস্থিত হচ্ছেন আবাসিকেরা।

সবার আগে এসেছেন মিস্ কাবেরী দত্তগুপ্তা। সকাল ছয়টায়। তখনও শয্যাত্যাগ করেনি সুজাতারা। কাল রাত্রে সুজাতার ভাল ঘুম হয়নি। কৌশিক হঠাৎ কেন এক ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলল তা ও কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না। অপরপক্ষে কৌশিকও একটু গুম মেরে গেছে। খাবার টেবিলে যে কথোপকথনটা হল সেটার কথাই ওর বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। ভাবছিল—সুজাতা কেন আলি-সাহেবকে প্রথম সাক্ষাতেই বলে বসেছিল— বাড়িতে সে একেবারে একা, চাকরটা পর্যন্ত নেই! আর আলি সাহেব কেন অমন ইঙ্গিত-পূর্ণ ভাষায় বললে 'আমার বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে এটা বর্ষণ-মুখর রাত্রি!' সুজাতাই বা অমন রাঙিয়ে উঠল কেন হঠাৎ? কৌশিকের ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল সে এসে পৌঁছানোর আগে সুজাতা আর আলী নির্জন বাড়িতে কী নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। আলি যখন আসে তখন কি সুজাতা গান গাইছিল—'কৈসে গোঁয়াইব-হরিবিনে দিনরাতিয়াঁ!' পাশাপাশি খাটে দুজনেই জেগে শুয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত। দুজনেই জেগে আছে। কেউই কিন্তু সাড়া দেয়নি। তারপর কখন দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল নিচের কলিংবেলটা আর্তনাদ করে ওঠায়।

ঃ এই, নিচে কে যেন কলিংবেল বাজাচ্ছে। কাঞ্চী এসেছে বোধহয়—কৌশিক সুজাতাকে ডেকে দেয়।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুজাতা। কাঞ্চী তো এত সকালে আসে না। নিচে নেমে আসে। দরজা খুলেই দেখে—কাঞ্চী নয়, আগন্তুক একজন নোতুন বোর্ডার। বছর পঁচিশ ত্রিশ বয়সের একজন মহিলা। চিকনের একটি শাড়ির উপর গরম ওভারকোট। দেখতে ভালই

—সুন্দরীই বলা চলে।। মেয়েটি বলে, আমার নাম কাবেরী দত্তগুপ্তা।

: সুপ্রভাত! আসুন, আসুন!—এত ভোরবেলা কোথা থেকে? আপনার না আজ দুপুরে আসার কথা?

: তাই স্থির ছিল। রেলওয়ে রিজার্ভেসান পেলাম একদিন আগে। কাল এসেছি—

: কাল এসেছেন! রাত্রে কোথায় ছিলেন?

: কাশিয়াঙে। ওখানে আমার একজন বন্ধুস্থানীয় লোক আছেন। তাঁর বাড়িতেই রাত্রে ছিলাম। ভোর বেলা উঠেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছি। যা বৃষ্টি—

: আসুন, ভিতরে আসুন—আপনার জামা-কাপড় একদম ভিজে গেছে।

কাবেরীর সঙ্গে কোন বেডিং নেই। আছে, একটা সুন্দর সাদা সুটকেশ। কালিপদ অসুস্থ। ফলে সুজাতা আর কাবেরী দুজনে ভাগাভাগি করে সেটা টেনে নিয়ে আসে দোতলায়। কাবেরীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল দোতলার সাত-নম্বর ঘরটা। সেটা পছন্দ হল কাবেরীর। ঘরে পৌছে কাবেরী বললে, আপনিই তো হোটেলের মালিক, তাই নয়?

: আমি একা নই। আমরা। স্বামী-স্ত্রী। আজই খোলা হল হোটেলটা। পরে ভাল করে আলাপ করা যাবে। চা খাবেন নিশ্চয়। আমরাও এখনও খাইনি।

: চা তো খাবই। একেবারে বাসি মুখে রওনা হয়েছি—

: ঠিক আছে। মুখ হাত ধুয়ে নিন। গীসার আছে, গরম জল পাবেন।

দুপুরে যে ট্রেনটা শিলিগুড়ি থেকে আসে সেটা এসে উপস্থিত হল বেলা চারটেয়। বৃষ্টির জন্য। কাক ভেজা হয়ে এসে উপস্থিত হলেন অরূপরতন মহাপাত্র। ছোটরেলের ট্রেনটা যে শেষ পর্যন্ত

এসে পৌঁছাবে এ ভরসাই নাকি ছিল না। প্রবল বর্ষণে অনেক জায়গায় ধ্বস নেমেছে। তবে লাইন চালু আছে এখনও। অরূপ-রতনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল দোতলার নয়-নম্বর ঘরটা। কিচেন-ব্লকের উপরে, সিঁড়ির পাশেই। অরূপ ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখলেন। প্রশংসা করলেন- যতটা না বাড়ির, তার চেয়ে বেশি তার রূপসজ্জার। সুজাতার রুচিকেই তারিফ করলেন বারে বারে। সারা বাড়িটা দেখিয়ে ওঁকে পৌঁছে দিচ্ছিল ওঁর সাত-নম্বর ঘরে। হঠাৎ সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল কাবেরীর সঙ্গে। সে নিচে নামছিল। সুজাতা ওঁদের পরিচয় করিয়ে দেয় : মিস্ কাবেরী দত্তগুপ্তা, আজই সকালে এসেছেন। আর ইনি মিঃ অরূপরতন মহাপাত্র, এ্যাডভোকেট। আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

কাবেরী কোন কৌতূহল দেখাল না। মামুলী নমস্কার করল শুধু।

অরূপ প্রতিনমস্কার করে বললে, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

: আমাকে ! কোথায় ?—কেমন যেন চমকে ওঠে কাবেরী।

: মাপ করবেন, আপনি কি ক্রিশ্চিয়ান ?

: ক্রিশ্চিয়ান ! না তো ! এমন অদ্ভুত কথা মনে হল কেন আপনার ?

অরূপ হেসে বলে, আমারই ভুল তাহলে। আমার এক খ্রীষ্টান বন্ধুর বিয়েতে একবার চার্চে গিয়েছিলাম—বছর খানেক আগে। সেখানে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম—

: না না—আমার বংশের কেউ কখনও গীর্জায় যায়নি। আপনি ভুল করছেন।

কাবেরী তরতরিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

অরূপ একটু হকচকিয়ে যায়। সুজাতাকে বলে, ভদ্রমহিলা কি অফেন্স নিলেন ?

ঃ অফেন্স নেওয়ার মত কোন কথা তো আপনি বলেননি।

ঃ না, তা বলিনি। আমারই ভুল।

সুজাতার মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার কথা। সেবারও অরূপরতন একজনকে দেখে বলেছিলেন—'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?' আর সেবার কিন্তু অরূপের ভুল হয়নি।

বিকাল নাগাদ এসে উপস্থিত হলেন আর একজন আগন্তুক। আসার ঘণ্টাখানেক আগে দার্জিলিঙ থেকে একটা টেলিফোন করে জানতে চাইলেন—সিঙ্গল-সীটেড ঘর পাওয়া যাবে কিনা। কৌশিক অবস্থা বেগতিক দেখে আপত্তি করেছিল, কিন্তু সুজাতা শোনেনি। সুজাতার মতে বোর্ডার হচ্ছে ওদের ব্যবসায়ের লক্ষ্মী। উদ্বোধনের দিনেই সে কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে না—যতই কেন না অসুবিধা হ'ক। ফলে ঘণ্টাখানেক পরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হলেন অজয় চট্টোপাধ্যায়। বৃদ্ধ সরকারী অফিসার ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। বিপত্নীক। ছেলে-মেয়েরা বিবাহিত এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। খেয়ালী মানুষ, মেজাজ একটু তিরিক্ষে। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তিনি ছবি এঁকে বেড়াচ্ছেন। পাহাড়ে এসেছেন ছবি আঁকতে। দ্বিতলের আট নম্বরে তাঁকে থাকতে দেওয়া হল।

বাসু-সাহেব সস্ত্রীক যখন এসে পৌঁছালেন তখন দিনের আলো মিলিয়ে গেছে।

বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় সবাই জমিয়ে বসেছেন ড্রইংরুমে। আলি-সাহেব, কাবেরী, অরূপ, অজয় চাটুজ্জে এবং কৌশিক। শুধ সুজাতা অনুপস্থিত। সে ছিল কিচেন-ব্লকে। এতগুলি প্রাণীর রান্নার জোগাড় তাকে করতে হচ্ছে একা হাতে। কালিপদ শয্যাশায়ী। কাঞ্চী আদৌ আসেনি। ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবার অবসর নেই সুজাতার। কৌশিক একবার এসেছিল কোন সাহায্য করতে হবে কি না জানতে; রূঢ়ভাবে সুজাতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুজাতার মেজাজ হঠাৎ এমন বিগড়ে গেল কেন কৌশিক কিছু

আন্দাজ করতে পারে না। অতএব সেও গুটি গুটি এসে বসেছে ড্রইংরুমে।

বাইরের দিক থেকে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন বাসু-সাহেব, চাকা-দেওয়া চেয়ারে সহধর্মিনীকে নিয়ে। কৌশিক সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়, আর ওঁদের বলে—আর এঁদের পরিচয় উনি আমাদের মামা আর মামীমা। মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল আর মিসেস্ রাণী বাসু। লেডিস এ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন! আমার একটা ঘোষণা আছে। এমন জমাট বর্ষার সন্ধ্যায় আপনাদের একটি সুখবর দিচ্ছি—আমাদের বাসু-মামুর ঝুলিতে অসংখ্য ইন্টারেস্টিং কেস-হিস্ট্রি আছে। উনি ছিলেন ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। ফলে উনি যদি একটা গোয়েন্দা গল্প ফাঁদেন আমরা অজান্তে ডিনার টাইমে পৌঁছে যাব!

আলি বলেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং! আপনার ঝুলি ঝেড়ে অতীত-দিনের কোনও একটা লোমহর্ষক কাহিনী বার করে ফেলন বাসু-সাহেব—

বাসু-সাহেব একটা সোফায় সবেমাত্র গুছিয়ে বসেছেন। পাইপ আর পাউচটা বার করে লক্ষ্য করে দেখছিলেন—টোবাকোটা ভিজে গেছে কি না। অন্যমনস্কের মত বলেন, উঁ? অতীতদিনের কোন লোমহর্ষক কাহিনী? নো, আয়াম সরি—

: শোনাবেন না?—হতাশ হয়ে প্রশ্ন করে কৌশিক!

: না! অতীতের কথা থাক! Let the dead past bury it's dead! তবে তোমাদের একেবারে নিরাশও করব না। অতি সাম্প্রতিক কালের একটা লোমহর্ষক কাহিনী তোমাদের শোনাব—

: সে তো আরও ভাল কথা—বলে ওঠে কাবেরী।

: উঁ? ভাল? তা ভাল খারাপ জানি না—আজই—এই ধর ঘণ্টা চৌদ্দ আগে দার্জিলিঙে একটা হোটেলে একটা মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী!

সবাই চমকে ওঠে খবরটা শুনে।

কৌশিক বলে, দার্জিলিঙের হোটেল? কোন হোটেলে?

: হোটেল—দ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা! রুম নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি! বাই দ্য ওয়ে—হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম আপনারা কেউ শুনেছেন?

দৃষ্টিটা উনি বুলিয়ে নেন ওঁর সোৎসুখ দর্শকবৃন্দের উপর।

সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করে সবাই। কেউ কোনও জবাব দেয় না। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্ট অজয় চাটুজ্জে গলাটা সাফা করে নিয়ে বলেন, আমি চিনি। ইন ফ্যাক্ট, ওখান থেকেই আসছি আমি। আমি কাল রাত্রে ঐ হোটেলে ছিলাম, রুম নম্বর একুশে।

: তাই নাকি! তা এতবড় খবরটা শোনেননি?—প্রশ্নটা পেশ করেন আলি-সাহেব।

অজয়বাবু একটু নড়ে চড়ে বসেন। বলেন, শুনব না কেন, শুনেছি। তাই তো চলে এলাম এখানে। ওখানে আর ছবি আঁকার পরিবেশ নেই। সওয়াল-জবাব শুরু হয়ে গেছে!

কৌশিক বলে, কী আশ্চর্য! এতক্ষণ তো আমাদের বলেননি কিছু?

: কী বলব? এটা কি একটা বলার মত কথা? আমরা এখানে এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে, স্ফুর্তি করতে। তার মধ্যে দারোগা-খুনের খবরটা জনে জনে বলে বেড়াতে হবে তার অর্থ কি?

: দারোগা! যে লোকটা মারা গেছে সে কি পুলিশের দারোগা ছিল?—প্রশ্নটা আবার পেশ করেন আলি-সাহেব।

বাসু-সাহেব অরূপরতনের দিকে ফিরে বলেন, রমেন গুহকে মনে আছে অরূপ?

: নাট্যামোদী রমেন দারোগা? আলবৎ। কেন কি হয়েছে তার?

: রমেন বদলি হয়ে এসেছিল দার্জিলিঙে। গতকাল বেলা বার-

টার সময় সে এসে ওঠে ঐ হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায়। আর আজ সকাল পৌনে ছ-টায় তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নিজের ঘরে, রুদ্ধদ্বার কক্ষে। এ কেস অব পয়েজনিং! ওর ফ্লাস্কে কেউ পটাসিয়াম সানায়াইড ফেলে গেছে!

সকলে ঘনিয়ে আসে। বিস্তারিত জানতে চায় ঘটনাটা। যতদূর জানা ছিল বাসু-সাহেব আনুপূর্বিক বলে যেতে থাকেন। মাঝে মাঝে পাদপূরণ করছিলেন রাণী দেবী। ইতিমধ্যে সুজাতাও মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে। আবার ফিরে যাচ্ছে রান্নাঘরে। রমেন গুহ সুজাতার বিশেষভাবে পরিচিত। বাসু-সাহেব সব কথারই উল্লেখ করলেন। কিন্তু জানালেন না দুটি সংবাদ। তেইশ নম্বর ঘরে এ্যাসট্রে থেকে উদ্ধার করা সিগ্রেটের টুকরার কথা; আর বাইস-নম্বরের ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের কাগজের কথাটা।

আলি-সাহেব বলে, ঐ মহম্মদ ইব্রাহিমের চেহারার কি বর্ণনা পেলেন?

সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বাসু-সাহেব বললেন, হাইট এবং স্ট্রাকচার এই ধরুন প্রায় আপনার মত। তবে লোকটার দাড়ি ছিল এবং চোখে চশমা ছিল—

আলি হেসে বললে, ভাগ্যে আমার তা নেই! না হলে আপনারা হয়তো আমাকেই সন্দেহ করতেন। আমি তো কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি, ইব্রাহিম-সাহেব চেক-আউট করবার ঘণ্টা খানেক পরে।

: এবং লোকটা পাইপ খেত!—পাদপূরণ করেন বাসু-সাহেব।

: পাইপ খেত! সেরেছে!—জ্বলন্ত পাইপটা নিয়ে আলি-সাহেব অভিনয় করেন যেন তিনি অত্যন্ত বিড়ম্বিত—কোথায় পাইপটা লুকোবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

কাবেরী বলে, মিস্টার আলি, আপনার ভয় নেই। বাসু-সাহেব নিজেও পাইপ খান!

: থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু! ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলেন!—আলী-সাহেব পাইপ টানতে থাকেন আবার।

: আর মিস্ ডিক্রুজা?—এবার জানতে চায় অরূপ।

প্রশ্নকর্তার দিকে না তাকিয়ে বাসু-সাহেব সরাসরি তাকালেন কাবেরী দত্তগুপ্তার দিকে। যেন তারই একটা দৈহিক বর্ণনা দেখে দেখে দিচ্ছেন সেইভাবে বলে গেলেন, হাইট—মাঝারি, রঙ—ফর্সা, বয়স কত হবে? এই ধরুন সাতাশ আঠাশ! সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী; মাপ নাকি—৩৪-২৮-৩২।

কাবেরীকে প্রথমটায় একটু নার্ভাস লাগছিল, কিন্তু শেষ বর্ণনাটায় সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। রাণী দেবীকে বলে, মামীমা, একটু সাবধানে থাকবেন! মামা যে ভাবে মেয়েদের দেখা মাত্র তাদের ভাইট্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স বুঝে ফেলছেন—

রাণী বললেন, উনি মিস্ ডিক্রুজাকে দেখেননি। শোনা কথা বলছেন!

আলি-সাহেব রসিকতা করে, কি দাদা কানে শুনেই এই! চোখে দেখলে--

বাধা দিয়ে রাণী বলে উঠেন, উনি আর একটা কথা বলতে ভুলেছেন! মিস্ ডিক্রুজা ভার্মিলিয়ান রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করে! তবে তোমার ভয় নেই কাবেরী, তুমি একাই তা করনি, সুজাতাও তাই করে। ঐ দেখ—

সুজাতা তখনই এসে দাঁড়িয়েছে পিছনের দরজায়।

চিত্রকর অজয় চাটুজ্জে এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। আপন মনে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্‌টে যাচ্ছিলেন। তাঁর দিকে ফিরে বাসু-সাহেব এবার বলেন, আচ্ছা চাটুজ্জেমশাই, আপনি কি একুশ নম্বর ঘরটা ছেড়ে আজ বাইশ নম্বরে আসতে চেয়েছিলেন?

উঁ?—চমকে বই থেকে মুখ তুলে অজয়বাবু বলেন, আমাকে বলছেন?

প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার পেশ করেন বাসু-সাহেব।

গুছিয়ে জবাব দেবার জন্যই প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইলেন কি না বোঝা গেল না, চাটুজ্জে মশাই জবাবে বললেন, হ্যাঁ! চেয়েছিলাম। আমার একুশ নম্বর ঘর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার আনডিস্টার্বড ভিয়ু পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই—

: তাহলে শেষ পর্যন্ত মহম্মদ ইব্রাহিমের ঘরটা নিলেন না যে?

: ঐ যে বললাম—আমি ও-ঘরে শিফট্ করার আগেই পুলিশে এসে ঘরটা তল্লাসী করল। ভাবলাম—'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'। মানে মানে সরে পড়লাম ওখান থেকে—

: মহম্মদ ইব্রাহিম ঘরটা ছেড়ে যাবার পর আপনি ঐ ঘরটা দেখতে গিয়েছিলেন, নয়?

: হ্যাঁ গিয়েছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম ও-ঘরের জানালা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা কেমন দেখতে পাওয়া যায়। মিনিট-খানেক ও-ঘরে ছিলাম আমি। কিন্তু, কেন বলুন তো?

: আচ্ছা, মিস্টার চ্যাটার্জি, এমনও তো হতে পারে ঐ এক মিনিটের ভিতর কোন অপ্রয়োজনীয় জিনিস আপনি ঐ ঘরের ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দেন? যেমন ধরুন, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, পুরানো ক্যাসমেমো অথবা দলাপাকানো একটা কাগজ—

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান অজয় চাটুজ্জে। কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, আজ রাত হয়ে গেছে; কাল সকালেই আপনার বিলটা পাঠিয়ে দেবেন। আমি চেক-আউট করব!

অরূপ বলে উঠে, কি হল মশাই? রাগ করছেন কেন?

: রাগ নয়! আমার এসব বরদাস্ত হয় না—এই গোয়েন্দাগিরি আর পুলিশী প্যাঁচ! আমি একটু আনডিস্টার্বড থাকতে চাই। এখানেও সওয়াল-জবাব শুরু হয়ে গেছে—

রীতিমত রাগ করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান অজয়বাবু।

অরূপ একটু ঝুঁকে বসে। বাসু-সাহেবকে প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার

স্যার? ঐ ইব্রাহিমের ঘরের ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে কিছু মালঝাল পাওয়া গেছে না কি?

বাসু-সাহেব পাইপটায় কামড় দিয়ে বলেন, কী দরকার অরূপ, ওসবের মধ্যে আমাদের যাবার? আমরা এসেছি পাহাড় দেখতে, বেড়াতে আর স্ফূর্তি করতে! কি বলেন?

দর্শকদলের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেন উনি। আলি কি একটা কথা বলতে গেল। তারপর কাবেরীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চুপ করে গেল হঠাৎ।

বাসু-সাহেব অরূপরতনকেই পুনরায় প্রশ্ন করেন, একটা কথা আমাকে বলো তো অরূপ, ঐ নকুল হুইয়ের কেসটায় তুমি কি ডিফেন্স-কাউন্সেলার ছিলে? কেসটার খবর আর আমি কিছু নিইনি।

: না। আমি সরকার পক্ষে ছিলাম।

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, সরকার পক্ষে! সে কি? মার্ডার কেস- এ তো পাবলিক প্রসিকিউটার থাকেন সরকার পক্ষে—

: তাই থাকেন।—বুঝিয়ে বলে অরূপ—নকুল হুইয়ের কেসটায় আমাকে সরকার পক্ষ থেকেই পি পি-র সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

: তাই নাকি? এ খবর তো বলনি আমাকে?—বাসু-সাহেব বলে ওঠেন।

: বলার সুযোগ পেলাম কোথায়? আপনি তো দীর্ঘদিন না-পাত্তা।

: তাহলে তুমিই হচ্ছ নকুল হুইয়ের নু-নম্বর শত্রু?

অরূপ অবাক হয়ে বলে, তার মানে? নকুল হুই তো মরে ভূত!

: জানি। কিন্তু শুনেছি নকুল সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত লড়েছিল। এত মামলা-লড়ার খরচ সে পেল কোথায়?

আলি বাধা দিয়ে বলে ওঠে—মাপ করবেন ব্যারিস্টার-সাহেব,

নকুল হুই চরিত্রটা এখনও এস্‌ট্যাব্‌লিস্‌ড হয়নি। আমরা কাহিনীর ঠিক রসাস্বাদন করতে পারছি না।

কৌশিক এবং অরূপ ভাগাভাগি করে পূর্ব-কাহিনীর মোটামুটি একটা খসড়া পেশ করে। অরূপরতন উপসংহারে বলে, নকুল হুই লোকটাকে আমরা ঠিকমত চিনতে পারিনি। দীর্ঘদিন ধরে সে আগরওয়াল-ইণ্ডাস্ট্রিস-এ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অনেক টাকা সে তলে তলে সরিয়ে ছিল—যে-কথা শেষপর্যন্ত জেনে যেতে পারেনি ময়ূরকেতন আগরওয়াল। নকুল থাকত নিতান্ত গরীবের মত—কিন্তু বেশ পুঁজি জমিয়ে ফেলেছিল সে। এমন কি ওর এক ভাইকে নাকি আমেরিকা পাঠিয়েছিল খরচ দিয়ে! ভাইটিও দাদার উপযুক্ত! মাকিন-মুলুকে নাকি নাম-করা গ্যাংস্টার হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। সেই ভাইই ওর মামলার খরচ দেয়। শুনেছি, ফাঁসির দিন মাকিন-মুলুক থেকে ওর সেই ভাই চলে এসেছিল ভারতবর্ষে!

বাসু-সাহেব নির্বাপিত পাইপটি ধরাতে ধরাতে বলেন. কী নাম নকুলের ভায়ের? সহদেব নাকি?

: হ্যাঁ, আপনি কেমন করে জানলেন?

: জানি না। আন্দাজ করছি। এপিক্যাল ইনফারেন্স মানে মহাভারতের ঐ রকমই নির্দেশ! তা সেই সহদেব বাবাজীবনের দৈহিক বর্ণনাটা কি?—কাবেরীর দিকে ফিরে যোগ করেন, যাকে বলে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স আর কি!

: আমি জানি না। সহদেবকে আমি স্বচক্ষে কোনদিন দেখিনি। —বলে অরূপ।

সুজাতা এই সময় এসে ঘোষণা করে: ডিনার রেডি!

সভা ভঙ্গ হল।

আহারাদি মিটতে যায় নাম দশটা। ইতিমধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও

বৃষ্টি থামেনি। ক্রমাগত বর্ষণ হয়ে চলেছে। খরস্রোতা উপলবন্ধুর জলধারা পাহাড়ের মাথা থেকে সর্পিল গতিতে ছুটে আসছে সমতলের সন্ধানে। বাতি এখনও জ্বলছে। যে কোনও মুহূর্তে ইলেকট্রিক অফ্ হয়ে যেতে পারে। সুজাতা ঘরে ঘরে মোমবাতি রেখে এসেছে। আহারাদি মিটিয়ে যে যার ঘরে চলে গেছেন। কৌশিকও শুতে যাবার উপক্রম করছে এমন সময় এসে উপস্থিত হলেন রাতের শেষ অতিথি !

আবার একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল পোর্চে।

সুজাতা আর কৌশিক দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরের বারন্দায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন একজন মাঝ-বয়েসি ভদ্রলোক। গাড়ির ভিতর বসেছিলেন আর একজন সুবেশিনী সুন্দরী মহিলা। ভদ্রলোক নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতদুটি এক করে বললেন, রাতটুকুর মত তলায় একখানা করে বালিশ আর উপরে একখানা পাকা ছাদ মিলবে ?··· আই মীন, আমি আমাদের মাথার কথা বলছি।

কৌশিক প্রতিনমস্কার করে বলে, এমন দুর্যোগের রাত্রে কোন গৃহস্থ 'না' বলতে পারে ?

গাড়ির ভিতর থেকে এক-গা-গহনা বলে ওঠেন, তুমি চুপ কর দিকিনি !

কৌশিক আঁৎকে ওঠে : আমায় বলছেন ?

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, আজ্ঞে না, আমায়। ডায়লগটা ছাড়তে একটু দেরী হয়েছে ওঁর···আই মীন, আপনার ডায়লগের আগে ওঁর ডায়লগ !···ই'য়ে, উনি, মানে আমার বৈটার-হাফ !

ভদ্রমহিলা সে কথায় কর্ণপাত না করে এবার সরাসরি কৌশিককে প্রশ্ন করেন, এটা হোটেল তো ?

কৌশিক সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করে।

: তবে গৃহস্থের কথা উঠ্‌ছে কেন ? ডব্‌ল্‌-বেড রুম হবে ?

কৌশিক জবাব দেবার আগেই উপরের ধাপ থেকে সুজাতা বলে, হবে না।

ভদ্রমহিলা সুজাতাকে আপাদমস্তক দেখে নেন একবার। তারপর তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কৌশিককেই পুনরায় প্রশ্ন করেন, অন্তত দুটো আলাদা সিঙ্গল-সীটেড ?

কৌশিক যেন শ্রুতিধর। সুজাতার দিকে ফিরে বলে, অন্তত দুটো আলাদা সিঙ্গল সীটেড ?

ভদ্রমহিলা ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। কৌশিক নিরুপায় ভঙ্গিতে ভদ্রলোককে যেন কৈফিয়ৎ দেয়, উনি হলেন গিয়ে আবার আমার বেটার-হাফ।

ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা অগত্যা সুজাতার দিকে তাকান।

সুজাতা একই ভাবে বললে, হবে না!

ভদ্রলোক শ্রাগ করলেন। সুজাতা তাকে উদ্দেশ্য করে বললে, তবে নিচে একখানা করে বালিশ এবং উপরে একখানা পাকা ছাদ হতে পারে—

ভদ্রলোক চমকে তাকান সুজাতার দিকে।

সুজাতা পাদপূরণ করে : আই মীন, আমি আপনাদের মাথার কথা বলছি।

: এনাফ!—সোৎসাহে ভদ্রলোক মালপত্র নামাবার উদ্দেশ্যে পিছনের কেরিয়ারটা খুলে ফেললেন। কৌশিক হাত লাগায়। সুজাতাও। এক-গা-গহনা শুধু নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে নেমে আসেন। মালপত্র টানাটানিতে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না।

কৌশিক কাজ করতে করতেই বলে, আপাতত আসছেন কোথা থেকে ?

: Scylla আর Charybdis-এর মধ্যবিন্দু থেকে—মাল নামাতে নামাতে জবাব দেন ভদ্রলোক।

: আজ্ঞে ?—কৌশিক ব্যাখ্যা চায়।

: 'হর্নস্ অব এ ডায়লামা' বোঝেন ? তারই কেন্দ্রবিন্দু থেকে। এদিকে কার্শিয়াঙের পথে এক বিরাট খাদ, ওদিকে দার্জিলিঙের

রাস্তায় এক হোঁড়ল গর্ত! মাঝখানে স্যাণ্ডুইচ হয়ে পড়েছিলাম। অবস্থাটা বুঝতে পারছেন?

: জলের মত। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর অবস্থা আর কি! ঘুম শহরের এই হাল হয়েছে তা আমরা এখনও টের পাইনি!

: আমরা পেয়েছি। অস্থিতে অস্থিতে। দার্জিলিঙ থেকে কলকাতা যাচ্ছিলাম। বাধা পেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছিলাম দার্জিলিঙে। দুদিকেই রোড ক্লোসড।

খানকয়েক দশ টাকার নোট বার করে দিলেন তিনি ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে, বললেন, থোড়াসে রাখ্ দো ভাইসাব।—তোমার অবস্থাও তো মরে মরা! আপাতত ঘুমের রাজ্যে কোথায় ঘুমাবে দেখ!

একগাল হেসে ড্রাইভার ব্যাক করল ট্যাক্সিটা।

দ্বিতলের ছয়-নম্বর ঘরটা খুলে দিল সুজাতা। এটা সাজানো নেই, ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল না। এক-গা-গহনা এক নজর ঘরটা দেখে নিয়ে বললেন, ও রাম! পর্দা নেই, বেড-কভার নেই, ড্রেসিং টেবিল নেই—গুদাম ঘর নাকি?

কৌশিক আমতা আমতা করে বলে, আজ্ঞে না। এটা সবচেয়ে ভাল ডবল্-বেড রুম। আকাশ ফাঁকা হলে ঘরে বসেই কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ পাবেন। তবে ইয়ে···এটা ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল না। বেডিং পাঠিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু পর্দা বা ড্রেসিং টেবিল দিতে পারব না।

ভদ্রমহিলা আড়চোখে একবার সুজাতাকে দেখে নিয়ে বললেন, ভাড়া বোধকরি পুরোই নেবেন?

ভদ্রলোক তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আহাহা, ভাড়ার কথা কাল হবে। ইয়ে, আপনাদের কিচেন বোধকরি ক্লোস্‌ড হয়ে গেছে?

কৌশিক সুজাতার দিকে একটা চোরা চাহনি নিক্ষেপ করে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত তো বড় কম হয়নি! সব ছুটি হয়ে গেছে। তবে হেড-কুক বোধহয় এখনও জেগে আছে, নয়?—শেষ প্রশ্নটা সুজাতাকে।

সুজাতা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, হেড-বেহারাও জেগে আছে মনে হয়।

: অ!—কৌশিক ঢোক গেলে!

ভদ্রলোক সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, লোকে খেতে পেলে শুতে চায়···আই মীন, শুতে পেলে খেতে চায়! হবে কিছু? শুকনো বিস্কুট অবশ্য এখনও কিছু আছে আমাদের সঙ্গে।

সুজাতা বললে, ডবল-ডিমের অমলেট আর কফি হতে পারে।

: এনাফ! এনাফ!—ভদ্রলোক খুশিয়াল হয়ে ওঠেন।

তাঁকে আবার থামিয়ে দিয়ে গহণা-ভারাক্রান্তা বলে ওঠেন, তুমি থাম! তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, তাই বলে রাতের ফুল-মীল চার্জ করবেন না তো?

সুজাতা যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। দ্বারের কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, ফুল-মীলই চার্জ করা হবে। অসুবিধা থাকে তো দরকার কি? শুকনো বিস্কুট চিবিয়েই রাতটা কাটিয়ে দিন না?

ভদ্রমহিলাও ঘুরে দাঁড়ালেন। দুই বেটার-হাফ দুজনকে দেখে নিলেন। দুই ওয়ার্স-হাফ কণ্টকিত হয়ে ওঠেন। ভদ্রমহিলা কৌশিককে প্রশ্ন করেন, হোটেলের ম্যানেজার কে?

: ইয়ে, আমি!—কবুল করে কৌশিক।

: তবে সব কথায় উনি অমন চ্যাটাং চ্যাটাং করছেন কেন?

কৌশিক আমতা আমতা করে বলে, উনি যে আমার এমপ্লয়ার, হোটেলের মালিক!

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, আই কলো!—স্ত্রীকে বলেন, এই তুমি যেমন আমার গার্জেন আর কি?—সুজাতাকে বলেন, তা ফুল-মীল চার্জই দেব। কিচেন যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে বই কি। আমার জন্য এক প্লেট পাঠিয়ে দিন। আর ইয়ে···ওঁর যখন এত আপত্তি, উনি না হয় বিস্কুটই খাবেন রাত্রে।

: থাম তুমি ! ডাকাতের হাতে যখন পড়েছি, তখন নাচার !—মহিলা ক্ষুব্ধা !

: আমিও তো তাই বলছি—যাহা বাহান্ন তাহা পঁয়ষট্টি ! ও—দু' প্লেটই পাঠিয়ে দিন। আর কড়া দু-কাপ কফি !

: না এক কাপ কফি, এক কাপ চা ! রাত্রে কফি খেলে ওঁর ঘুম হয় না !

নিরুপায় ভদ্রলোক শ্রাগ করলেন শুধু।

সুজাতা নেমে আসে কিচেন-ব্লকে। ভদ্রলোক পকেট থেকে নামাঙ্কিত একটা আইভরি-ফিনিস্‌ড কার্ড বার করে কৌশিককে দেন। বলেন, আমার নাম ডঃ এ. কে. সেন, প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার। আপনার রেজিস্টারে কাল সকালে সই করে দেব। কেমন ?

কৌশিকও নেমে আসে। পায়ে পায়ে এসে হাজির হয় কিচন-ব্লকে। সুজাতা গুম মেরে আছে। কাল থেকেই তার কি যেন হয়েছে। কৌশিক ইতস্তত করে। ঘুরঘুর করে—সান্ত্বনাবাচক কি বলবে ভেবে পায় না। সুজাতা বলে, ডিমটা ফাটাও !

ফর্ক দিয়ে ডিম-গুলো ফাটাতে ফাটাতে কৌশিক একটা স্বগতোক্তি করে—প্রমোশনই হল আমার ! স্বাধীন ব্যবসা ! বিয়ের আগে ছিলাম হুজুরাইন-এর ড্রাইভার, বিয়ের পরে হলাম হেড-বেহারা।

সুজাতা হাসল না পর্যন্ত !

ওরা ভেবেছিল কর্মব্যস্ত উদ্বোধনের দিনটার বুঝি এখানেই সমাপ্তি। ভুল ভেবেছিল। হেড-কুক অমলেট নিয়ে, আর হেড-বেহারা কফি ও চা নিয়ে দ্বিতলে যখন পৌঁছে দিয়ে এল, ভদ্রলোক তখন সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, সো সরি ! আপনাদের চাকর-বেহারা পর্যন্ত শুয়ে পড়েছে দেখছি। খুব কষ্ট দিলাম আপনাদের।

সুজাতা অম্লান বদনে বললে, সঙ্কুচিত হবার কী আছে ? একস্ট্রা চার্জ তো সেই জন্যেই দিচ্ছেন !

শুভরাত্রি জানিয়ে ওরা নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঠিক তখনই ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। ঘড়ির দিকে নজর গেল স্বভাবতই। রাত পৌনে এগারোটা।

দুজনেই নেমে আসে আবার। সুজাতাই তুলে নিল টেলিফোনটা ঃ হ্যালো! 'রিপোস' হোটেল।···হ্যাঁ, আছেন। কোথা থেকে বলছেন?

শুনে নিয়ে সুজাতা কৌশিককে বলে, তোমাকে খুঁজছে। ও. সি. সদর, দার্জিলিঙ।

ঃ থানা! কেন কি হল আবার?—সঙ্কিত কৌশিকের প্রশ্ন।

ঃ কি হল তা নিজের কানে শোন!—রিসিভারটা হস্তান্তরিত করে সুজাতা পা বাড়ায়। যায় না কিন্তু। অপেক্ষা করে।

ঃ কৌশিক মিত্র বলছি। কে বলছেন?

ঃ নৃপেন ঘোষাল। ও.সি. দার্জিলিঙ সদর। ব্যারিস্টার সাহেব জেগে আছেন?

ঃ না। ঘুমোচ্ছেন। কেন কি হয়েছে? ডেকে দেব?

ঃ না, থাক। তা হলে আপনাকেই বলি। সব কথা টেলিফোনে বলা যাবে না। আকারে-ইঙ্গিতে বলব—বুঝে নেবেন। শুনুন ঃ ব্যারিস্টার-সাহেবের কাছে শুনেছেন নিশ্চয় আজ সকালে দার্জিলিঙ-এর একটি হোটেলে—

ঃ হ্যাঁ, জানি, কাঞ্চনজঙ্ঘায়—

প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে নৃপেন ঘোষাল, প্লীস ডোণ্ট মেন্শেন এনি নেম!···শুনুন! আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে যে, সন্দেহভাজন লোকটা এখন ঘুমে আছে, রিপোস্-এর কাছাকাছি। হয়তো রিপোস্-এর ভিতরেই! দ্বিতীয়ত যে ঘটনা দার্জিলিঙে ঘটেছে অনুরূপ একটি ঘটনা হয়তো ঘুমে ঘটতে যাচ্ছে। হয়তো রিপোস্-এর ভিতরেই! ফলো?

কৌশিক অকপটে স্বীকার করে, না! আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!

: পারছেন! বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই নয়?—না বোঝার কি আছে?

: এমন সব অদ্ভুত কথা অনুমান করার হেতু?

: সে-কথা টেলিফোনে বলা যায় না।···শুনুন···আজ রাত্রেও আপনাদের ওখানে ঐ জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে। খুব সতর্ক থাকবেন। বুঝলেন?

কৌশিক বিহ্বল হয়ে বলে, একটু ধরুন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে ফের আপনার সঙ্গে কথা বল্‌ছি।

টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে কৌশিক সুজাতাকে ব্যাপারটা জানায়। সুজাতা ওর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে তার মাউথপীসে বলে, মিসেস্ মিত্র বল্‌ছি। আপনার কথা আমরা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বড় 'ইনসিকিওর্ড' বোধ করছি। কিছু করা যায়?

ও-প্রান্ত ইতস্তত করে বলে, মুশ্‌কিল কি জানেন, কাট-রোড ভেঙে গেছে। ঘুম আউটপোস্টে ব্যাপারটা আমি টেলিফোনে জানিয়েছি। ওরা ওয়াচ রাখবে। আপনারা ওখান থেকে পারতপক্ষে কোন টেলিফোন কল ইনিশিয়েট করবেন না।

মরিয়া হয়ে সুজাতা বলে, থানা থেকে কেউ এসে থাকতে পারে না, আজ রাত্রে?

: ওখানকার লোকাল ফাঁড়িতে তেমন লোক কেউ নেই।··· আচ্ছা এক কাজ করছি···আমার একজন অফিসারকে পাঠাচ্ছি। মিস্টার পি. কে. বাসু, তাকে চেনেন। এখান থেকে জীপে বাতাসিয়া লুপ পর্যন্ত যাবে, বাকি পথ হেঁটে যাবে। আপনারা জেগে থাকবেন, যাতে কলিং বেল বাজাতে না হয়।

: ধন্যবাদ। কী নাম বলুন তো তাঁর?

: সুবীর রায়।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ওরা অপেক্ষা করতে থাকে। ঘড়ির কাঁটা

টিক্ টিক্ করে এগিয়ে চলেছে। আর বাইরে একটানা ধারাপাত। আর কোথাও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বোর্ডাররা যে-যার ঘরে ঘুমে অচেতন। শেষ বাতি নিবেছে ডাক্তার সেন-এর ঘরে। তাও আধঘণ্টা হয়ে গেল। ড্রইংরুমের ঘড়িটা সাড়ে এগারোটায় ঢং করে সাড়া দিল। সারা ঘুম ঘুমে অচেতন।

কৌশিক বললে, যাও তুমি শুয়ে পড়! আমি জেগে আছি।

সুজাতা জবাবে বলে, শুয়ে লাভ নেই! ঘুম হবে না। আর আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন মনে হয়।

ওর অনুমানই ঠিক। রাত বারোটায় সদর দরজার কাচের উপর একটা টর্চের আলোর সঙ্কেত হল। নিঃশব্দে উঠে গেল কৌশিক। পাল্লাটা একটু খুলে প্রশ্ন করল, কে?

ঃ সুবীর রায়!

ঃ আসুন।

আগন্তুক ভিজা বর্ষাতিটা খুলে ফেলে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। বয়স ত্রিশের কোঠায়। হাতে একটা এ্যাটাচি। ওদের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, মিস্টার আর মিসেস্ মিত্র নিশ্চয়?

কৌশিক ঘাড় নেড়ে জানায় ওর অনুমান সত্য।

ঃ কোন্ ঘরে আমি থাকব দেখিয়ে দিন। কাল সকালে কথা হবে।

ঃ কিন্তু ব্যাপারটা কি?

ঃ কেন? ও. সি. বলেন নি টেলিফোনে?

ঃ বলেছেন। সংক্ষেপে। টেলিফোনে তো সব কথা বলা যায় না। এমন আশঙ্কা করার কারণটা কি?

ঃ সেটা কাল সকালে বলব। আপনাদের জেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। যা করার আমিই করব। কিন্তু থাকব কোন ঘরে?

ঃ আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

কৌশিক ওকে ঘরটা দেখিয়ে দিল। এক তলার চার নম্বর ঘর।

সুজাতাও এল পিছন পিছন। ঘরে ঢুকেই সুবীর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। এ্যাটাচি কেসটা খুলে একটা ম্যাপ বার করে। বলে, এটা এ বাড়ির প্ল্যান। আমরা আছি এই ঘরে। এবার বলুন—কে কোন ঘরে আছেন ?

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, আমাদের হোটেলের প্ল্যান পেলেন কোথায় ?

সুবীর বিরক্ত হয়ে বলে. অবান্তর কথা বলে রাত বাড়ানোর দরকার আছে কি ?

কৌশিক আর প্রশ্ন করে না। উপস্থিত আবাসিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়. আর কে কোন ঘরে আছেন তা প্ল্যানে দেখিয়ে দিতে থাকে। সুবীর প্ল্যানের গায়ে নামগুলি লিখে নিল। তারপর বললে, গুড নাইট !

অসহিষ্ণুর মত কৌশিক বলে ওঠে, একটা কথা অন্তত বলুন— দার্জিলিঙে যে ঘটনা ঘটেছে তা হঠাৎ রিপোস্-এ ঘটতে পারে এমন ধারনা কেন হল আপনাদের ?

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে সুবীর বললে, বিশে ডাকাতের নাম শুনেছেন ?

ঃ বিশে ডাকাত ! না। কে সে ?

কিম্বদন্তীর বিশে ডাকাত ! সে নাকি ডাকাতি করতে যাবার আগে নোটিশ দিয়ে আগেভাগেই জানিয়ে দিত। রমেনবাবুকে যে মেরেছে সে ঐ বিশে-ডাকাত-এর উত্তরসূরী ! সে-ও অমন চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে তার সেকেণ্ড টার্গেট আছে ঘুম-এ, ঘুম-এর এই রিপোস্ হোটেলে !

সুজাতা বলে, কী বলছেন আপনি ! বিংশ শতাব্দীর কোন ক্রিমিনাল এমন মূর্খামি করে ?

ঃ তাই তো দেখা যাচ্ছে। মুর্খামি নয়—লোকটা ওভার কন্‌-ফিডেন্ট ! ইচ্ছা করেই সে এটা করেছে। খুনীর একমাত্র উদ্দেশ্য

প্রতিশোধ নেওয়া। যাকে প্রাণে বধ করবে তাকে আগে ভাগে জানিয়ে না দিলে যেন তার তৃপ্তি হচ্ছে না। লোকটা অত্যন্ত পাকা ক্রিমিনাল। আমেরিকায় বাকেলো-অঞ্চলে গ্যাংস্টার দলে তার নাম আছে। বেঙ্গল পুলিসের এই আমাদের সে মনে করে চুনোপুটি!

লোকটা কে তা আপনারা জানতে পেরেছেন?

ঃ অন্তত নামটা আন্দাজ করা গেছে। তার নাম সহদেব হুই।

সুজাতার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে যায়, বলে, সহদেব হুই! নকুল হুইয়ের ভাই?

ঃ হ্যাঁ। তাই আমাদের অনুমান!

একটু ইতস্তত করে সুজাতা বলে, ওর সেকেণ্ড টার্গেট কে জানেন?

সুবীর হেসে ফেলে। বলে, না। সহদেব আমাকে বলেনি। তবে নকুল হুইয়ের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের মধ্যেই কেউ একজন হবেন। আপনারা আন্দাজ করতে পারেন?

কৌশিক গম্ভীর হয়ে বলে, পারি! ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু!

সুবীর হেসে বললে, তাও ভাল। আপনাদের মুখ দেখে আমি কিন্তু ভেবেছিলাম বুঝি আপনাদের দুজনের কেউ।

পাঁচ

৩রা অক্টোবর। বৃহস্পতিবার। বৃষ্টির বিরাম নেই। ক্রমাগত বর্ষণে চরাচর বিলুপ্ত। এদিকে আজ সকাল থেকে 'রিপোস' রীতিমত হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছে। সকালবেলা আবাসিকেরা যখন প্রাতরাশ-টেবিল্-এ এসে বসলেন তখন নবাগতদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেবার কথা মনে হল না কৌশিকের। কালিপদ খাড়া হয়েছে। জ্বর নেই তার। ভোরবেলা থেকে সুজাতার হাতে

হাতে কাজ করছে। বৃষ্টি সত্ত্বেও কাঞ্চী এসেছে ভিজতে ভিজতে বর্ষাবিধ্বস্ত বস্তীর একটি মর্মন্তুদ বর্ণনা সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সুস্থির হয়ে শুনবার অবকাশ ছিল না সুজাতার। সে ক্রমাগত টোস্ট-পোচ-অমলেট আর হাফ-বয়েল বানিয়ে চলেছে ফরমায়েশ মত। কাঞ্চী আর কালিপদ পর্যায়ক্রমে পৌছে দিয়ে আসছে চা আর কফি। হোটেল জমে উঠেছে।

আবাসিকরা দেখলেন দুটি নূতন মুখ। ডঃ সেন আর সুবীর রায়। মিসেস সেনকে অবশ্য দেখতে পেলেন না ওঁরা। তিনি তাঁর দ্বিতলের কামরা থেকে নামলেন না আদৌ। তাঁর ব্রেকফাস্ট কাঞ্চী পৌছে দিয়ে এল দ্বিতলের ছয়-নম্বর ঘরে। বোধকরি এই সাতসকালে তাঁর যথোপযুক্ত প্রসাধন সারা হয়নি—তাই তিনি এই শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করলেন।

সকালে উঠে প্রথম সুযোগেই কৌশিক বাসু-সাহেবের সঙ্গে দেখা করে। গতকাল রাত্রে যে তিনজন নবীন অতিথির আবির্ভাব ঘটেছে তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ দাখিল করে। বাসু-সাহেব শুনে বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ, সুবীর রায় নামটা আমার জানা। তাকে এ ঘরে নিয়ে এস, আর অরূপকেও খবর দাও—সুজাতা বোধকরি রান্নাঘর ছেড়ে আসতে পারবে না, নয় ?

কৌশিক বলেছিল, এখন তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। তা হোক, আমিই তো রইলাম। এখানে যা কিছু আলোচনা হবে তা আমি তাকে জানিয়ে দেব।

মিনিট দশেক পরে বাসু-সাহেবের ঘরে একটি গোপন বৈঠক বসল। অরূপরতন আর সুবীর রায় যোগ দিল তাতে। কৌশিক সুবীরকে পরিচয় করিয়ে দিল ওঁদের সঙ্গে। বেচারি স্থির হয়ে বসতে পারছিল না আলোচনা সভায়। তাকে বারে বারে দেখে আসতে হচ্ছিল ঘরের চারপাশ। কেউ আড়ি পেতে শুনছে কি না। না, শুনছে না। ডঃ সেন তাঁর উত্তমার্ধের সঙ্গে তাস খেলছেন নিজের

ঘরে ; আলি-সাহেব নিজের ঘরে একটি ইংরাজি ডিটেকটিভ উপন্যাসে বুঁদ। কাবেরী আর অজয়বাবু আছে দোতলার উত্তরের বারান্দায়। কাবেরী বসে আছে একটি টুলে, উদাস ভঙ্গিতে আকাশ পানে তাকিয়ে। অজয়বাবু ক্রেয়নে তার একটি স্কেচ করছেন। দুজনে ভাব হয়ে গেছে বেশ। সুন্দরী তন্বী কাবেরী দত্তগুপ্তা এবং বৃদ্ধ চিত্রকর অজয় চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে।

বাসু-সাহেব বলেন, মিস্টার রায়, আপনার কথা নৃপেন ঘোষাল আমাকে বলেছিল—

বাধা দিয়ে সুবীর বললে, আপনি স্যার আমাকে 'তুমিই' বলবেন—

: তা না হয় বলব, কিন্তু—

কৌশিক আবার উঠে পড়ে। বলে, আমি বরং বাইরে গিয়ে বসি—

তাকে বাধা দিয়ে রাণী বলেন, না। তুমি থাক কৌশিক। আমিই বরং ব্যুহমুখে জয়দ্রথের ভূমিকায় থাকি। তেমন তেমন কাউকে আসতে দেখলেই আমি গান ধরব—

হুইল-চেয়ারে পাক্ দিয়ে রাণী দেবী বার হয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে বারান্দায়। ড্রইংরুমে, যেখানে পিয়ানোটা বসানো আছে তার পাশের দরজার কাছে থামলেন তিনি—যাতে দুদিকেই নজর রাখা যায়।

বাসু-সাহেব বললেন, রিপোস-এর বাসিন্দারা এখন স্পষ্টতঃ দুটি দলে বিভক্ত। প্রথম দলে আছেন একজন ভাল্‌নারেব্‌ল্। তিনি যে কে তা আমরা ঠিক জানি না তবে সে দলের সভ্যসংখ্যা পাঁচ—রাণী, সুজাতা, কৌশিক, অরূপ আর আমি। দ্বিতীয় দলের মধ্যে আছেন একজন সুচতুর দক্ষ ক্রিমিনাল—তার রেঞ্জ হচ্ছে আলি, কাবেরী, ডঃ এ্যাণ্ড মিসেস সেন এবং অজয় চট্টোপাধ্যায়।

: এঁরা সবাই?—অবাক হয়ে প্রশ্ন করে কৌশিক।

ঃ সবাই নয়, এঁদের মধ্যে যে কোন একজন অথবা দু'জন। নৃপেন এবং সুবীরের ধারণা—এবং আমিও তাদের সঙ্গে একমত—রমেন গুহের মৃত্যুর পিছনে আছে সহদেব দুই-এর হাত। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ। ইব্রাহিম যদি স্বয়ং সহদেব হয় তবে সন্দেহ করতে হবে আলি এবং ডক্টর সেনকে। আর সহদেব যদি কোন এজেন্ট লাগিয়ে থাকে তবে অজয়বাবুকেও নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে। অপরপক্ষে মিস্ ডিক্রুজা যদি রমেন গুহর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকে তবে কাবেরী আর মিসেস্ সেনকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলে না।

অরূপ প্রশ্ন করে, প্রথমে বলুন তো—আপনারা কেন মনে করছেন রমেন গুহর মৃত্যুতেই ব্যাপারটার যবনিকাপাত ঘটেনি? রিপোস-এ আমাদের মধ্যে ঐ ঘটনার পুনরাভিনয় হবার কথা আশঙ্কা করা হচ্ছে কেন?

বাসু-সাহেব বলেন, কালকে সে কথার কিছুটা ইঙ্গিত আমি দিয়েছি। ইব্রাহিমের পরিত্যক্ত ঘরটা সার্চ করতে গিয়ে নৃপেন একখণ্ড কাগজ পায়, ঐ ঘরের ময়লা-ফেলা কাগজের ঝুড়ি থেকে। কাগজটা আমার কাছে নেই—নৃপেন নিয়ে গেছে, না হলে তোমাদের দেখাতাম—

বাধা দিয়ে সুবীর বলে, কাগজখানা আমার কাছে আছে—

ঃ তোমার কাছে? নৃপেন দিয়েছে?

ঃ হ্যাঁ, এই দেখুন।

এ্যাটাচি কেস খুলে কাগজখানা সে বাসু-সাহেবকে দেয়। সবাই ঝুঁকে পড়ে। হাতে হাতে কাগজখানা ঘোরে। অবশেষে সেটি বাসু-সাহেবের হাতে আসে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাগজটা পরীক্ষা করেন। আলোর সামনে সেটা ধরেন, যেন একশ-টাকার নোট জাল কি না দেখছেন। কৌশিক লক্ষ্য করে দেখল, কাগজটা দলামচা করা হয়েছিল। কোঁচকানোর দাগ আছে। তার উপর-

প্রান্তে পারফোরেশনের চিহ্ন—যেন ফুটো-ফুটো করা নোটবইয়ের একটি ছেঁড়া পাতা। একটি প্রান্ত মসৃণ আর দুটি প্রান্তে যেন তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে নেওয়ার চিহ্ন। কাগজটায় কালো কালিতে লেখা :

এক : দ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেল, দার্জিলিং

দুই : দ্য রিপোস, বাতাসিয়া লুপ, ঘুম

তিন: ?

সুবীর বললে, বেশ বোঝা যাচ্ছে—রিপোস-এ দ্বিতীয়বার হত্যা করলেও আততায়ীর প্রতিহিংসাপরায়ণতা নিবৃত্ত হবে না। সে তিন-নম্বর হত্যার কথাও চিন্তা করছে!

কৌশিক বললে, নকুল হুইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য যদি এ পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে তবে আমার মনে হয় আততায়ীর তিন'নম্বর টার্গেট হচ্ছেন বাসু-সাহেব। তাই নয়?

অরূপ বললে, তুমি-আমিও হতে পারি। সুজাতা দেবীই বা কেন বাদ যাবেন? আমরা সকলেই নকুল হুইয়ের ফাঁসির জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

: সে কথা ঠিক। কৌশিক মেনে নেয়।

বাসু-সাহেব চোখ বুঁজে আপন মনে পাইপ খাচ্ছিলেন। সুবীর বলে, আপনি স্যার কিছু ভাবছেন মনে হচ্ছে?

বাসু-সাহেব চোখ মেলে তাকান। বিচিত্র হাসেন। বলেন, ভাবছি ? হ্যাঁ, ভাবছি বইকি ! ভাবনার কি অন্ত আছে। কিন্তু আজ এই পর্যন্তই—উঠে দাঁড়ান তিনি, বলেন—দীর্ঘ আলোচনার কিছু নেই, এভাবে আমরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা চালালে ওপক্ষ সজাগ হয়ে যাবে। সো উই ডিজল্ভ্ !

বেশ বোঝা গেল সকলেই এ সিদ্ধান্তে মর্মাহত। এত সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হবে তা কেউ ভাবেনি। কিন্তু রায় দিয়ে বাসু-সাহেব উঠে পড়েছিলেন। গুটি গুটি বেরিয়ে এসে বসলেন বারান্দার একান্তে একটি ইজি-চেয়ারে। কৌশিক, অরূপ আর সুবীর একে একে চলে গেল। রাণী দেবী তাঁর চাকা-দেওয়া চেয়ারে পাক মেরে ঘনিয়ে এলেন বাসু-সাহেবের পাশে। ধ্যানস্থ বাসু-সাহেব বোধ করি তা টের পাননি। তিনি চমকে উঠলেন রাণী দেবীর প্রশ্নে : কী হল ? এরই মধ্যে কনফারেন্স শেষ ?

: উঁ ? হুঁ !—অন্যমনস্কের মত জবাব দিলেন বাসু। মাঝে মাঝে পাইপে টান দিচ্ছেন। কুণ্ডলী পাকিয়ে যে ধোঁয়াটা উঠছে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে।

: কী ভাবছ বলতো ?—আবার প্রশ্ন করেন রাণী বাসু।

: ভাবছি ? ঐ রমেন গুহর মৃত্যু-রহস্যের কথাই ভাবছি। আর কি ভাবব ?

সহানুভূতির সুরে রাণী বলেন, কে খুন করেছে তার কোন কুলকিনারাই করতে পারছ না, নয় ?

বিচিত্র হাসলেন বাসু-সাহেব। অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, সেইটেই তো ট্রাজেডি রানু। লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি। কে খুন করেছে, কেন করেছে, এখানেই বা কাকে খুন করতে চাইছে তা বোধহয় সব ঠিকমতই জানতে পেরেছি আমি। অথচ আমার হাত পা বাঁধা। সব জেনেও কিছু করতে পারছি না ! ট্রাজেডিটা বুঝতে পারছ ?

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাণী দেবী। স্তব্ধ বিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন তাঁর অদ্ভুত-প্রতিভা স্বামীর দিকে। যাঁকে তিনি অত্যন্ত নিবিড় ভাবে চেনেন—অথচ সে লোকটা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত! তারপর যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলেন, খুনী কে তা তুমি জান?

মুখটা সূচালো করলেন বাসু-সাহেব। সম্মতি-সূচক গ্রীবা সঞ্চালন করলেন শুধু।

ঃ সে এখানে আছে? এই রিপোস-এ?

একই রকম ভঙ্গি করেন উনি।

ঃ আমাকে বলতে পার না?

এবার দুদিকে মাথা নাড়েন উনি।

ঃ আমাকে না পার, অন্তত সুবীরকে বল নেপেনকে কিম্বা বিপুলকে?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাসু-সাহেবের। বললেন, উপায় নেই রানু। আমার হাতে যা এভিডেন্স আছে তাতে কনভিকশান হবে না। এখন কেউ আমার কথা বিশ্বাসই করবে না—বলবে পি. কে. বাসু একটা বদ্ধ পাগল! লোকটাকে হাতে নাতে ধরতে হবে—তার দ্বিতীয় খুনের প্রচেষ্টার পূর্ব-মুহূর্তে।

ঃ ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যাবে না?

ঃ তা কিছুটা যাবে। কিন্তু উপায় কি বল? ওকে গিলটি বলে প্রমাণ করব কি ভাবে? ওর দাড়ি, চশমা নেই—বীর বাহাদুর আইডেন্টিফিকেশান্ প্যারেডে ওকে চিনতে পারবে না। তাছাড়া বীর বাহাদুর অথবা মহেন্দ্র ওকে দেখেছে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। একমাত্র যদি মিস ডিক্রুজাকে খুঁজে বার করতে পারি তবে হতে পারে। সে সারাদিন ইব্রাহিমকে দেখেছে। বাট হু নোস্—ডিক্রুজা ওর পাপের সাথী হতেও পারে, আবার নাও পারে!

রাণী দেবী ঝুঁকে পড়ে বললেন, কী ক্লু পেয়েছ তুমি?

: নিজেই গোয়েন্দাগিরি করতে চাও? উ?

: বল না?

: সুবীরের হাতে ঐ 'এক : দুই : তিন' লেখা কাগজখানায়। প্রথমবার আমি ভাল করে ওটা পরীক্ষা করিনি। এবার তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করেছি। ওর ভিতরেই সহদেব ভুল করে রেখে গেছে তার আত্মপরিচয়! বেচারি সহদেব দুই!

: তবে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছ না কেন?

: ঐ যে বললাম—যে সূক্ষ্ম যুক্তির বিচারে আমি ইব্রাহিমকে সনাক্ত করেছি তাতে খুনী আসামীর কনভিক্‌শান হয় না! আমাকে জানতে হবে মিস্ ডিক্রুজা ওর পার্টনার-ইন-ক্রাইম ছিল কি না। একমাত্র সেই পারবে ইব্রাহিমকে সনাক্ত করতে। সহদেবকে আমি খুঁজে পেয়েছি; এখন খুঁজছি শুধু মিস্ ডিক্রুজাকে—এই রিপোস-হোটেলেই!

: হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে বাহাদুর আর মহেন্দ্রকে আনানো যায় না?

এ-প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই বাসু-সাহেব দেখলেন কৌশিক এগিয়ে আসছে ওঁদের দিকে।

: কী ব্যাপার? এমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন হে তোমাকে?

: কেলেঙ্কোরিয়াস্ কাণ্ড স্যার! এক নম্বর: টেলিফোন লাইনটা সকাল থেকে ডেড হয়ে গেছে। দু-নম্বর: কার্ট-রোডের সঙ্গে এ বাড়িটার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—প্রকাণ্ড একটা ধ্বস নেমেছে। আর তিন নম্বর—সুজাতা নোটিশ দিয়েছে তার ভাঁড়ারে ডিম-মাংস-রুটি-মাখন সব বাড়ন্ত!

বাসু-সাহেব রাণী দেবীর দিকে ফিরে বলেন—এই নাও তোমার প্রশ্নের জবাব!

: কী প্রশ্ন?—জানতে চায় কৌশিক।

: উনি দার্জিলিঙ থেকে আজ আবার দু-জনকে নিমন্ত্রণ করে

আনতে চাইছিলেন। সেযাক, মন-খারাপ কর না। যেমন করে হ'ক এ ক'দিন চালিয়ে নিতে হবে আমাদের। দু-তিন দিনের মধ্যেই সভাজগতের সঙ্গে নিশ্চয় যোগাযোগ করা যাবে।

ঃ রেডিওর খবর—তিস্তা ব্রিজ ভেসে গেছে। মহানন্দা, তোরশা, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী সবাই একসঙ্গে ক্ষেপে উঠেছে। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদা—এক কথায় গোটা উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ভেসে গেছে—এতবড় বন্যা নাকি উত্তরবঙ্গে কখনও হয়নি।

বেলা নয়টা নাগাদ বৃষ্টি মাথায় করেই কৌশিক বার হয়ে পড়ল। রেন-কোট চড়িয়ে। গাড়ি চলবে না, পায়ে হেঁটে। স্থানীয় বাজারে কিছু পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে।

অজয় চাটুজ্জে কাবেরীর স্কেচটা শেষ করে এনেছেন।

আলিও আগাথা ক্রিস্টি শেষ করে আনল প্রায়।

ছয়-নম্বর ঘরে মিসেস সেন ক্রুদ্ধা। তৃতীয় এক কাপ চা চেয়ে তিনি প্রত্যাখ্যাতা হয়েছেন। কিচেন-ব্লক থেকে কাঞ্চা এসে জানিয়ে গেছে এখন আর চা পাঠানো সম্ভবপর নয়। প্রাতঃরাশের সময়সীমা অতিক্রান্ত। কিচেন এখন লাঞ্চের ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

বাসু-সাহেব গুটি গুটি এসে হাজির হলেন রান্নাঘরে ঃ কী সুজাতা? আজ কী রান্না হচ্ছে?

ঃ মাংস যা আছে এ-বেলা হয়ে যাবে। মাংসই করছি। আলুসেদ্ধ এই নামল।

হঠাৎ ওর কাছে ঘনিয়ে এসে বাসু-সাহেব বলেন, একটা কাজ কর তো সুজাতা। চট করে একবার দোতলার সাত-নম্বরে চলে যাও। কাবেরীর ঘরে। কাবেরী এখন ঘরে নেই—কিন্তু ওর ঘর তালাবন্ধও নেই। কাবেরী উত্তরের বারান্দায় বসে ছবি আঁকাচ্ছে। ওর ঘরে গিয়ে চট্ করে ওর এ্যাসট্রেটা নিয়ে এস তো—

ঃ এ্যাসট্রে! এ্যাসট্রে কি হবে?

ঃ তুমি তো আগে এমন ছিলে না সুজাতা! 'কেন' এ প্রশ্ন তো আগে করতে না—

ঃ কিন্তু এদিকে আমার তরকারিটা—

ঃ ওটা আমি দেখছি—

ওর হাত থেকে খুন্তিটা নিয়ে বাসু-সাহেব উনানের উপর বসানো তরকারির ডেক্‌চিটায় মনোনিবেশ করেন।

খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে সুজাতা—ওঁর অনভ্যস্ত হাতে খুন্তি নাড়া দেখে।

ঃ হাসছ কেন?—রোষকষায়িত দৃষ্টিতে বাসু-সাহেব জানতে চান।

হাসি থামিয়ে সুজাতা গম্ভীর হয়ে বলে, অবজেক্‌শান য়োর অনার। ইট্‌স্ ইনকম্পিটেন্ট, ইর্‌রেলিভ্যান্ট এ্যাণ্ড ইম্মেটিরিয়্যাল!

বাসু-সাহেব হেসে ফেলেন। বলেন, অব্‌জেক্‌শান ওভার-রুল্‌ড। যাও, ওপরে যাও!

সুজাতা দু-মিনিটের ভিতরেই এ্যাসট্রেটা নিয়ে ফিরে এল। বাসু-সাহেব তার ভিতর থেকে গুটিতিনেক সিগারেটের স্টাম্প উদ্ধার করে বললেন, আশ্চর্য! কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা শূন্যগর্ভ ছিল! যাও, এটা রেখে দিয়ে এস আবার।

আরও মিনিট পনের পরে। বাসু-সাহেবের প্রস্থানের পরে আলি-সাহেব রান্নাঘরে এসে হাজির। প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে বলে, আসতে পারি? অনধিকার প্রবেশ করছি না তো?

সুজাতা চমকে ওঠেঃ আসুন, আসুন। কী ব্যাপার? একেবারে হেঁসেলে?

ঃ আপনাকে প্রথম সাক্ষাতেই বলেছিলাম মহিলাদের হেঁসেল সম্বন্ধে আমার কিছুটা পারদর্শিতা আছে।

ঃ তা বলেছিলেন। ধন্যবাদ। আমার সাহায্যের কোন দরকার হবে না।

আলি একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ে। বলে, চার-নম্বরে ঐ যে লম্বামতন ভদ্রলোক এসে উঠেছেন ওঁর নামটা কি বলুন তো ?

ঃ মিস্টার রায়।

ঃ কী রায় ?

সুজাতা হেসে বললে, তাহলে রেজিস্টার দেখতে হবে। পুরো নামটা মনে নেই।

ঃ কখন এলেন উনি ?

ঃ হঠাৎ ওঁর বিষয়ে এত কৌতূহলী হয়ে পড়লেন কেন ?—সুজাতা প্রতিপ্রশ্ন করে।

একটু থতমত খেয়ে আলি বলে, না না, শুধু ওঁর সম্বন্ধে নয়, ছয় নম্বর ঘরের দম্পতির বিষয়েও আমার কৌতূহল আছে।

ঃ তা আমার কাছে কেন ? ছয়-নম্বরে গিয়ে আলাপ জমালেই পারেন।

আলি সে-কথার জবাব দেয় না। আলুর ডেকচিটা টেনে নেয়। তাতে ছিল সিদ্ধ করা আলু। আপনমনে সে আলুর খোসা ছাড়াতে থাকে। আড়চোখে সুজাতা একবার তাকে দেখে নিল। বোঝা গেল যে কোন কারণেই হ'ক, আলি ভাব জমাতে চায়। সুজাতার তাতে আপত্তি নেই। এবার সে নিজে থেকেই বলে ওঠে, মিস্টার আলি, এবার বলুন তো, আপনি প্রথম সাক্ষাতেই কেমন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে বাড়িতে আমি একেবারে একা আছি ? চাকরটা পর্যন্ত নেই ?

আলি-সাহেব জবাব দিল না। আপন মনে আলুর খোসা ছাড়াতে থাকে। সুজাতা একটা প্লেটে কিছু তরকারি তুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, দেখুন তো নুন-ঝাল ঠিক আছে কি না ?

প্লেটে ফুঁ দিতে দিতে আলি বললে, একসঙ্গে এত লোকের রান্নায় আন্দাজ পাচ্ছেন না, তাই নয় ? ছিল দু'জনের ছোট্ট সংসার— হয়ে গেল রাবণের গুষ্টি !

: রাবণের গুষ্টি ! আপনি হিন্দুদের এপিক পড়েছেন দেখছি।

: তা পড়েছি। ঐ রামায়ণ না মহাভারতেই আছে না আর একটা কথা—'শত্রু এবং স্ত্রীর কাছে মিথ্যাভাষণে পাপ নেই।'

: হঠাৎ এ-কথা কেন ?

তরকারিটা ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হয়েছে। আলি পরখ করে বললে, মুন-ঝাল ঠিক আছে।

: তা তো আছে—কিন্তু হঠাৎ ও কথা কেন বললেন ?

আলি হেসে বললে, দেখুন, আমি ব্যাচিলার মানুষ। দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি অত জানি না। আচ্ছা, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছে হামেশাই মিছা কথা বলে, তাই নয় ?

: কেন ও কথা বলছেন তাই আগে বলুন ?

: কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের ?

সুজাতা রাগ দেখিয়ে বললে, বলব না !

আলি হাসে। বলে, নেহাৎ পীড়াপীড়ি করছেন তাই বলছি—পশু-রাতে আপনাদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, বিকালের দিকে দার্জিলিঙ যাবার একটা প্রোগ্রাম আপনাদের করা ছিল, তাই নয় ? মিস্টার মিত্র বললেন যে, কাঞ্চন ডেয়ারিতে গিয়ে উনি আটকা পড়েছিলেন। কথাটা উনি সত্য বলেননি। পশু-সকালে উনি দার্জিলিঙেই গিয়েছিলেন।

: আপনি কেমন করে জানলেন ?

: পশু আমি ছিলাম দার্জিলিঙে। বেলা একটার সময় একটা চাইনিস্ রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ সারছিলাম। আমার থেকে তিন টেবিল দূরে মিস্টার মিত্র দুপুরে ওখানে লাঞ্চ করেন। উনি নিশ্চয় আমাকে লক্ষ্য করেননি—

: দার্জিলিঙ-এ চাইনিস রেস্তোরাঁ ? আছে না কি ?

: আছে। গ্রেনারির ঠিক উল্টোদিকে। 'সাংগ্রি-লা' তার নাম।

: ওখানে বসে সে খাচ্ছিল ?

বিচিত্র হাসল আলি। বললে, আপনি রাগ না করেন তো আরও কিছু নিবেদন করি। উনি একা খাচ্ছিলেন না—ওঁকে সঙ্গ-দান করছিলেন একজন বাঙালী ভদ্রমহিলা। বিবাহিতা, বয়স বছর ত্রিশ—আর ভয়ে-বলব-না-নির্ভয়ে-বলব? ভদ্রমহিলা রীতিমত সুন্দরী।

সুজাতা আত্মসংবরণ করে কৃত্রিম হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে, ভয়ে বলতে যাবেন কোন দুঃখে? নির্ভয়েই বলুন। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন মিস্টার আলি,—আমরা বিংশ-শতাব্দীর শেষপাদে বাস করছি। আমার স্বামী কোনও সুন্দরী মহিলার সঙ্গে লাঞ্চ সেরেছেন শুনলে আমি মূর্ছা যাব না।

আলি একটা মোগলাই-কুর্নিশ ঝেড়ে বলে, বেগম-সাহেবা মহানুভব। বিংশ-শতাব্দীর শেষপাদের ঔদার্যটার সম্বন্ধে আমার ধারণা সীমিত। আচ্ছা ধরুন, যদি সংবাদ পান লাঞ্চান্তে আপনার কর্তা সেই সুন্দরী মহিলাটিকে একটা 'সোনার কাঁটা' উপহার দিচ্ছেন?

ঃ সোনার কাঁটা? সেটা কী জাতীয় বস্তু?

ঃ ও-বস্তুটা আমিও এর আগে কখনও দেখিনি। একটা অলঙ্কার। মেয়েরা খোঁপায় কাঁটা গোঁজে—লোহার, এ্যালুমিনিয়ামের, প্ল্যাস্টিকের। কবরী-বন্ধন যাতে শিথিল না হয়ে যায় তাই তার ব্যবহার—এই যেমন আপনি এখন কাঁটা গুঁজেছেন আপনার খোঁপায়! সোনার কাঁটার মূল্য কবরীবন্ধনে নয়—

ঃ কৃষ্ণা-করবী-শোভা-বর্ধনে?—প্রশ্ন করে সুজাতা।

ঃ অথবা রক্ত-করবী-সোহাগ-বর্ধনে! — জবাব দেয় আলি।

ঃ সংবাদটা বিচিত্র!

ঃ সন্দেশটা বিস্বাদ না হলেই হল! ভরি-তিনেক ওজনের অমন একটা সোনার কাঁটা মিস্টার মিত্রের পকেট থেকে যাত্রা শুরু করে তাঁর মিত্রাণীর খোঁপা বিদ্ধ করলে বেদনাটা অন্যত্র অনুভূত হবার

কারণ নেই। কি বলেন? আফটার-অল, আমরা বিংশ-শতাব্দীর শেষপাদে বাস করছি!

সুজাতা এবারও হেসে বলে, মিস্টার আলি, রামায়ণ তো আপনার পড়া। নিশ্চয় জানেন—রাবণের গুষ্টি শেষ হবার পর বিভীষণ সিংহাসনে বসে—কিন্তু কোনও হিন্দুই সত্যবাদী বিভীষণকে শ্রদ্ধা করে না—তার পরিচয় 'ঘরভেদী বিভীষণ!'

আলি এ জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সামলে নিয়ে কী একটা কথা সে বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দ্বারপথে কে-যেন বলে ওঠে, এক্সকিউজ মি। ভিতরে আসতে পারি?

ঃ কে? ডক্টর সেন! আসুন। এখানে কি মনে করে?

হাসি হাসি মুখে ডঃ সেন ঢুকে পড়েন রান্নাঘরে। অনুনয়ের ভঙ্গিতে সুজাতাকে বলেন, এক কাপ চা কি কিছুতেই হতে পারে না, মিসেস মিত্র? আমার বেটার-হাফ, মানে···

স্ত্রৈণ ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে সুজাতার করুণা হয়। আলি এগিয়ে এসে বলে, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। আমার নাম এন. আলি—আমি আছি তিন নম্বরে।

ঃ সো গ্ল্যাড টু মীট য়ু। একা আছেন, না সস্ত্রীক?

ঃ আজ্ঞে না। স্ত্রীর বালাই নেই। আমি কনফার্মড ব্যাচিলার!

ঃ শুনে সুখী হলাম। বেঁচে গেছেন মশাই!

আলি বলে, কেন? আপনি যে মরে আছেন তা তো মনে হচ্ছে না। 'কপোত-কপোতী যথা উচ্চনীড়ে' সকাল থেকে তো দিব্যি তাস পিটছেন!

ঃ আরে তাতেই তো হয়েছে বখেড়া। এ পর্যন্ত আমার বেটার-হাফ সাড়ে বাহান্ন টাকা হেরেছেন। মেজাজ ক্ষেপচুরিয়াস! তাতেই তো চায়ের সন্ধানে এসেছি।

আলি অবাক হয়ে বলে, সাড়ে বাহান্ন টাকা! আপনি কি স্ত্রীর সঙ্গে স্টেকে তাস খেলছেন?

ঃ আলবৎ! স্টেক ছাড়া 'ফিশ্' খেলা যায় নাকি!

ঃ তাই বলে স্ত্রীর সঙ্গে?

ঃ কেন নয়? ওঁর রোজগার আর আমার রোজগার আলাদা। জয়েণ্ট এ্যাকাউণ্ট নেই। এমন কি I. T. O.-র ফাইল নাম্বার পর্যন্ত পৃথক।

ঃ এমনও হয় না কি?

ঃ আজ্ঞে! বে-থা তো করেননি—কী খবর রাখেন!—অম্লানবদনে ডাক্তার-সাহেব ডেকচি থেকে একটি সিদ্ধ আলু নিয়ে মুখে পুরলেন।

সুজাতা হেসে বললে, ঠিক আছে ডাক্তার-সাহেব, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এক কাপ না দু-কাপ?

ঃ বানাতেই যখন হচ্ছে তখন আর এক কাপ কেন? যাহা-সাড়ে বাহান্ন তাহা পঁয়ষট্টি। দু-কাপই হ'ক।—দ্বিতীয় একটি বড়-মাপের আলু তুলে নিয়ে তাতে কামড় বসান ডাক্তার সেন। বাঁ-হাতে এক চিমটে নুনও তুলে নেন।

সুজাতা বললে, আচ্ছা আপনি যান, আমি দু-কাপ চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঃ থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু! না, না, কষ্ট করে আর পাঠিয়ে দিতে হবে না। আমি অপেক্ষা করছি। নিজেই নিয়ে যাব।

সুজাতা হাসতে হাসতে বলে, ততক্ষণে বোধহয় আমার আলু সিদ্ধর ডেকচি খালি হয়ে যাবে।

ঃ আলু সিদ্ধ! ও আয়াম সরি!—এঁটো আলুটা উনি ফেরত দিতে উদ্যত হন।

ঃ এ কী করছেন! ওটা আপনার এঁটো!

ঃ এঁটো! ও আয়াম্ সরি—আলুটা কোথায় রাখবেন উনি ভেবে পান না।

ঃ একি! তুমি এখানে বসে আলু সেদ্ধ খাচ্ছ!—প্রবেশ করেন মিসেস সেন।

ঃ আমি ? না, মানে, ইয়ে—হঠাৎ বাকি আলুটা মুখে পুরে দিয়ে ডাক্তার-সাহেব আলি-সাহেবের দিকে ফিরে বলতে চাইলেন—'আমার বেটার-হাফ'; কিন্তু মুখে গরম আলু সিদ্ধ থাকায় কথাটা বোঝা গেল না।

ঃ চলে এস উপরে !—রীতিমত ধমকের সুরে ডাকেন মিসেস্ সেন।

ঃ না, মানে তোমার চা-টা—

ঃ থাক। চা আর লাগবে না।

সুজাতার গরম জল তৈরীই ছিল। ইতিমধ্যে সে চা ছেড়েছে 'পট'-এ। বললে, চা যে হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

রুখে ওঠেন মিসেস সেন, বলছি লাগবে না ! এক ঘণ্টা আগে চা চেয়েছি, এতক্ষণে শোনাচ্ছেন—হয়ে গেছে !

সুজাতা ডক্টর সেনের দিকে ফিরে বললে, না লাগে পাঠাব না। তবে আপনার অর্ডার অনুযায়ী দু-কাপ চা বানানো হয়েছে। বিল-এ দু-কাপ চায়ের দাম কিন্তু ঠিকই উঠবে ডঃ সেন !

ঃ কারেক্ট ! তা তো উঠ্‌বেই। তবে এক কাজ করুন—আমার কাপটা দিন, নিয়ে যাই। ওঁর যখন আর লাগবে না—

ঃ থাম তুমি ! উ কী ডাকাতের রাজ্যে এসে পড়েছি ! দাম দেব আর চা খাব না ! ইয়াকি নাকি ! তুমি এস—ওরা বেহারা দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

ওয়ার্স-হাফকে উদ্ধার করে উপরে উঠে গেলেন মিসেস সেন।

ছয়

বেলা প্রায় এগারোটা। নিজের ঘরে বসে কাবেরী তন্ময় হয়ে একখানা ছবি দেখছিল, ওরই ছবি। সিপিয়া রঙে ক্রেয়নে আঁকা। সদ্য সমাপ্ত। হঠাৎ দ্বারের কাছে প্রশ্ন হল, ভিতরে আসতে পারি ?

সচকিত হয়ে কাবেরী লক্ষ্য করে দ্বারপথে দাঁড়িয়ে আছেন চার-নম্বরের সুদর্শন ভদ্রলোক।

ঃ আসুন, আসুন। কী ব্যাপার?

ঃ কৌতূহলটা দমন করতে পারলাম না। ছবিটা দেখতে পারি?

ঃ দেখুন না! আপত্তি কিসের—ছবিখানা বাড়িয়ে ধরে কাবেরী।

সুবীর জমিয়ে বসে একখানা চেয়ারে। সমজদারের মত ওর ছবিখানা দেখতে থাকে—কাছে ধরে, দূরে ধরে। দু-একবার কাবেরীর দিকেও তাকায়। তারপর বলে, ছবিটা সুন্দর, তবে অরিজিনালের মত সুন্দর নয়।

কাবেরী একটু রাঙিয়ে ওঠে. কথা ঘোরাবার জন্য বলে, আপনার পরিচয়টা কিন্তু আমি জানি না। আপনি তো আছেন ঐ চার-নম্বরে?

ঃ হ্যাঁ। আমার নাম সুবীর রায়। আরে, আপনার সুটকেশটা তো চমৎকার!

—ওপাশে রাখা সাদা রঙের সুটকেশটা লক্ষ্য করে সে। বলে, এগুলোকেই ভি. আই. পি সুটকেশ বলে, তাই নয়?

কাবেরী বলে, সখ করে কিনেছি। যদিও আমি ভি. আই. পি. মোটেই নই।

ঃ বেড়াতে এসেছেন বুঝি দার্জিলিঙে?—প্রশ্ন করে সুবীর সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে।

ঃ হ্যাঁ। ছুটিতে—

ঃ অত সকালে কোথা থেকে এলেন?

ভ্রূ-কুঞ্চিত হল কাবেরীর। বললে, আপনি তো এলেন মধ্য-রাত্রে—আমি কখন এসেছি তা জানলেন কেমন করে?

সুবীর মামুলী গলায় বললে, সুজাতাদেবী বলছিলেন আপনি নাকি সেই কাক-ডাকা ভোরে এলেন।

কাবেরীও মামুলী-গলায় জবাব দিল, কাক-ডাকা ভোরই বটে।

আমি পশু রাত্রে কার্শিয়াঙে হল্ট করেছিলাম। রাত ভোর হতেই এখানে চলে এসেছি।

: কার্শিয়াঙে কোথায় ছিলেন? হোটেলে?

আবার সচকিত হয়ে ওঠে কাবেরী। বলে, কেন বলুন তো?

: না, আমি ফেরার পথে কার্শিয়াঙে দু-দিন থাকব ভাবছি। তাই জানতে চাইছি কোন হোটেলে ছিলেন, তাদের ব্যবস্থা কেমন—

কাবেরী কৃত্রিম হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে, যদি কোন হোটেল ছেড়ে রাত থাকতে বোর্ডার পালিয়ে বাঁচে সেটায় থাকবার কথা ভাবছেন ফেরার পথে?

সুবীর বললে, তাহলে ধরে নিন ভুল করে সেটাতে উঠে যাতে নাকাল না হতে হয় তাই নামটা জানতে চাইছি। কার্শিয়াঙে কোন হোটেলে ছিলেন?

কাবেরী আবার প্রশ্ন এড়িয়ে বলে, আপনি যে পুলিশের মত জেরা করছেন!

: তাই করছি, কারণ পুলিশ বিভাগেই কাজ করি আমি। ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্সে। এসেছি একটা খুনের তদন্তে। সেই প্রসঙ্গেই আমি জানতে চাইছি—পয়লা অক্টোবর রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন? রাত দশটার পর থেকে বাকি রাত।

পকেট থেকে একটি নোটবুক বার করে বলে, এবার বলুন—

কাবেরীর মুখটা সাদা হয়ে যায়। ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে, কিন্তু কথা কিছু বলে না। ঠিক সেই মুহূর্তেই বিনা-নোটিশে ঘরে ঢুকে পড়লেন অজয় চাটুজ্জে। সরাসরি কাবেরীকে বললেন, ও ক্রেয়নে ঠিক এফেক্টটা আসেনি, বুঝলে! আমি অয়েলে আর একখানা আঁকতে চাই। তোমার সময় হবে এখন?

কাবেরী তৎক্ষণাৎ সামলে নেয় নিজেকে। বলে, সময় হবে না? কী বলছেন? নিশ্চয় হবে। এখনই বসবেন? চলুন—

এতক্ষণে অজয়বাবু সুবীরকে নজর করেন ; বলেন, এঁকে তো ঠিক, মানে—

কাবেরী প্রথম সুযোগেই সুবীরের ট্রাম্প-কার্ডখানা খুলে দেখায়। বলে, উনি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স বিভাগের একজন অফিসার, মিস্টার সুবীর রায়। এসেছেন একটা খুনের তদন্তে।

সুবীর ক্রুদ্ধ আক্রোশে কাবেরীর দিকে তাকায়।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মুছতে মুছতে অজয়বাবু বলেন—অ !

: বসুন অজয়বাবু। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে আমার।

অজয় বসেন না। চশমাটা নাকে চড়িয়ে বলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের সেই দারোগার মৃত্যু সংক্রান্ত প্রশ্ন নিশ্চয় ?

: হ্যাঁ, তাই। আপনি তো ঐ হোটেলেই ছিলেন ?

: এস কাবেরী—অজয় প্রস্থানোদ্যত।

: আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন না ?

: দেব ! যখন কোর্টের সমন পাব, সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াব, তখন দেব ! উঃ ! হরিব্ল, এস কাবেরী।

কাবেরীর হাতটা ধরে অসঙ্কোচে টানতে টানতে নিয়ে চলেন অজয় চাটুজ্জে। পিছন থেকে সুবীর বলে, কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না। কোর্টের সমন ছাড়াও পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়—

: হয়, জানি। কিন্তু তার একটা স্থান-কাল-পাত্র আছে ! পথে ঘাটে প্রথম সাক্ষাতেই অমন মোড়লি করার কোন অধিকার পুলিশের নেই। বুঝেছেন ?— ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন উনি।

বেলা সওয়া এগারোটা।

সুবীর এসে উপস্থিত হল আলি-সাহেবের ঘরে। দরজায় নক করে বললে, আসতে পারি?

আগাথা ক্রিস্টিকে বালিশের উপর উবুড় করে রেখে আলি বললে সচ্ছন্দে! ইন ফ্যাক্ট আপনার সঙ্গে আলাপ করতে যাব ভাবছিলাম। আমার নাম এন. আলি।

সুবীর বললে, আমার নাম সুবীর রায়। ক্রিমিনাল ইণ্টেলিজেন্সে আছি। এসেছি একটা খুনের তদন্তে।

ভেবেছিল প্রতিপক্ষ হকচকিয়ে যাবে। তা কিন্তু গেল না আলি। হেসে বললে, তাস খেলেন?

: কেন বলুন তো?— ভ্রূকুঞ্চিত সুবীরের প্রশ্ন!

: প্রথম ডীলেই রঙের টেক্কা পেড়ে লীড দিচ্ছেন তো, তাই বলছি!

: মানে?

: আগাথা ক্রিস্টি পড়ছিলাম কিনা—গোয়েন্দাগল্পে দেখেছি ডিটেকটিভরা সহজে আত্মপরিচয় দেয় না ওভাবে।

: সকলের পদ্ধতি এক নয়। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

: এ বিনয়ও ডিটেকটিভ-সুলভ নয়। নিশ্চয় করতে পারেন। করুন। আমি প্রস্তুত।

: আপনি তো এখানে এসেছেন পয়লা তারিখ রাত সওয়া নয়টায়। কোথা থেকে এলেন?

: দার্জিলিঙ থেকে।

: দার্জিলিঙে কবে এসেছিলেন?

: ঐ পয়লা তারিখ বেলা বারোটায়। একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে চেপে।

: ঐ ট্যাক্সিতে একজন পুলিশ অফিসার আর একজন ভদ্র-মহিলাও এসেছিলেন?

ঃ না। কোন পুলিশ অফিসার বা মহিলা ছিলেন না আমার সঙ্গে।

ঃ কোন হোটেলে উঠেছিলেন আপনি ?

হোটেল কুণ্ডুস। স্বনামেই উঠেছিলাম—হোটেল রেজিস্টার হাতড়ে দেখতে পারেন সত্য কিনা।

ঃ কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে স্বনামে হোটেল কুণ্ডুস-এ ঘর বুক করে আপনি বেনামে অন্য কোনও হোটেলে উঠেছিলেন ?

আলি হেসে ফেলে। বলে, যেমন ধরা যাক মহম্মদ ইব্রাহিম এই ছদ্মনামে হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘায় ?

ঃ কেন নয় ?

ঃ নয় এজন্য যে সে-ক্ষেত্রে অজয়বাবু এবং ব্যারিষ্টার বাসু আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলতেন। ওঁরা দুজনেই ছিলেন ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘায়।

ঃ আপনি ভুলে যাচ্ছেন—মহম্মদ ইব্রাহিম হোটেলে ছিল মাত্র কয়েক মিনিট। চেক-ইন করেই সে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে রাত সাতটায় এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই চেক-আউট করে বেরিয়ে যায়। রাত আটটায় দার্জিলিঙ থেকে রওনা হলে রাত ন'টার মধ্যে তার পক্ষে রিপোস এ এসে পৌছানো সম্ভব!

আলি পাইপ ধরালো। বললে, তাহতো হিসাবে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনি একটিমাত্র কাজ করতে পারেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের রুম-সার্ভিসের বেহারা বীর বাহাদুরকে এখানে নিয়ে আসুন। সে সনাক্ত করে যাক—ইব্রাহিম বা মিস ডিক্রুজা এখানে আছে কিনা!

সুবীর বলে, বীর বাহাদুর! ও নাম আপনি জানলেন কেমন করে ?

ঃ এখানেই কারও কাছে শুনেছি বোধহয়! হোটেল রিপোসে তো দিবারাত্র এই গল্পই হচ্ছে। আসুন—

একটি সিগ্রেট সে বাড়িয়ে ধরে সুবীরের দিকে। পাইপখোর তাহলে সৌজন্যের খাতিরেও সিগ্রেট রাখে!

মোটকথা আলি-সাহেব বিন্দুমাত্র নার্ভাস হল না।

সাড়ে এগারোটায় সুবীর এসে হানা দিল ডক্টর সেনের ঘরে। সেখানেও বিশেষ কিছু সুবিধা হল না। কিন্তু একটা খটকা লাগে সুবীরের। ডক্টর সেনকে অফার করা সিগ্রেটের প্যাকেট থেকে মিসেস সেন অম্লানবদনে একটি সিগ্রেট নিয়ে ধরালেন। দিব্যি হুস হুস করে টানলেন এবং একবারও কাশলেন না। ডক্টর আর মিসেস সেন সুবীরকে অনেক পীড়াপীড়ি করলেন তাদের আড্ডায় যোগ দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী করাতে পারলেন না। মিসেস সেন এ হোটেলের ব্যবস্থাপনার ভূয়সী নিন্দা করলেন এবং কথা প্রসঙ্গে জানালেন ওঁর এক ভাই আছেন 'ম্যারিকায়, এক ভাই পশ্চিম জার্মানিতে। উনি নাকি ডক্টর সেনকে পই পই করে বলছেন চাটি-বাটি গুটিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে—কিন্তু ঘরকুনো ডাক্তার সেন কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না দেশ ছেড়ে যেতে।

মোট কথা সুবীর হালে পানি পেল না।

ঠিক বারোটার সময় সুবীর এসে হানা দিল বাসু-সাহেবের ঘরে।

: এস! আর কিছু ক্লু পাওয়া গেল?—প্রশ্ন করলেন বাসু।

: কিছু না। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?

: পারছি। আন্দাজ নয়। অকাট্য প্রমাণ!

ঘনিয়ে আসে সুবীর: বলেন কি স্যার? কে?

: কে নয় সুবীর? কারা? দুজনকেই! ইব্রাহিম এণ্ড মিস ডিক্রুজা।

সুবীর অবাক হয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ করে ঘনিয়ে আসে। বলে, নৃপেনদা অবশ্য আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন; কিন্তু আপনি যে দুজনকেই···কি ব্যাপার বলুন তো?

বাসু-সাহেব নিবন্ত পাইপে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বলেন, আয়াম সরি! এখনই কিছু বলতে পারছি না। আগে জাল গুটিয়ে আনি—সবটা একসঙ্গে ভাঙব।

হতাশ হয় সুবীর। বলে, তাহলে, মানে—আমি এখন কী করব?

ঃ তোমার অফিসিয়াল ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাও।

আজও সারাদিনে বর্ষণ ক্ষান্ত হল না। ক্রমাগত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কাট রোড দিয়ে গাড়ি যাতায়াত বন্ধ। টেলিফোন তো অনেক আগেই গেছে—এবার গেল ইলেকট্রিক ব্যাটারি-সেট রেডিও কারও কাছে নেই। রেডিওর শেষ সংবাদ যা পাওয়া গেল তাতে জানা গেছে যে, সমগ্র উত্তর-বঙ্গ একটা ঐতিহাসিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে। মিলিটারিকে ডাকা হয়েছে উদ্ধারের কাজে। তিস্তা ব্রীজ নিশ্চিহ্ন। আরও অনেক ব্রীজ ভেঙ্গে গেছে। মহানন্দা তিস্তা ফুলে ফেঁপে ডুবিয়ে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, জেলার পর জেলা।

সন্ধ্যার পর কালিপদ ঘরে ঘরে মোমবাতি রেখে গেল। মিট-মিটে আলোয় বাড়িটাতে একটা ভূতুড়ে ভাব এসেছে! সুবীর রায়ের পরিচয় জানতে আর কারও বাকি নেই। সকলেই যেন কিছুটা সতর্ক, সন্দিগ্ধ। এক ঘেয়ে বৃষ্টির মত রিপোস-এর জীবন-যাত্রা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে একেবারে।

বৈচিত্র্য দেখা দিল রাত ঠিক আটটা তেত্রিশে।

তার তিন মিনিট আগের কথা। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায়। ড্রইংরুমের ঘড়িটা ঠিক যখন ঢং করে সময়টা ঘোষণা করল।

সুজাতা তখন ছিল রান্নাঘরে। একাই। রাতের রান্না করছিল সে একা। কালিপদ নিজের কাজে ব্যস্ত। কাঞ্চী বাড়ি চলে গেছে।

আলি-সাহেব নিজের ঘরে মোমবাতির আলোয় আগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপ' গল্পের শেষ ক'টা পাতায় ডুবে আছে।

সুবীর ছিল তার নিজের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে। গীসারের জল এখনও কিছুটা গরম আছে। সে হট বাথ নেবার একটা চেষ্টা করছে। গরমজল আর পাওয়া যাবে না।

ডক্টর আর মিসেস সেন জোড়া মোমবাতি জ্বেলে ফিশ্ খেলছেন। মিসেস সেন সারাদিনে প্রায় শওয়া শ' টাকা হেরে বসে আছেন!

কৌশিক একটা ছাতি আর টর্চ নিয়ে উঠেছে ছাদে। মই বেয়ে জল-নিকাশী গাটারটা সাফা করতে। গাছের পাতায় জল-নিকাশী গাটারটা আটকে গেছে।

বাসু-সাহেব তাঁর ঘরের সামনে উত্তরের বারান্দায় অন্ধকারে বসেছিলেন একটা ইজিচেয়ারে। শুনছিলেন গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে ঝরে পড়া বৃষ্টির শব্দ।

ঠিক তখনই ঢং করে ড্রইংরুমের ঘড়িতে সারে আটটা বাজল।

রাণী দেবী ছিলেন নিজের ঘরে। হুইলচেয়ারটা তাঁর ঘরের উত্তরের জানালার কাছে টেনে নিয়ে আপন মনে তিনি গান ধরলেন। এমন অকালবর্ষণের সন্ধ্যায় তিনি কিন্তু কোন বর্ষা-সঙ্গীত ধরলেন না। কি জানি কেন আপন খেয়ালে শুরু করলেন অতি পরিচিত একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত:

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম—"

ঘরে ঘরে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া শুরু হল।

সুজাতা তার প্রেসার-কুকারের মুখটা খুলে দিল। সোঁ সোঁ শব্দটা বন্ধ হল।

মিসেস সেন তাস ডীল করা বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন, কে গাইছে বল তো?

বাসু-সাহেব দেশলাইটা জ্বালবার উপক্রম করছিলেন। থমকে গেলেন তিনি।

সুবীর বোধহয় গানটা শুনতে পায়নি। তার কলের শব্দ বন্ধ হল না।

অরূপ পায়চারি করছিল এক তলার দক্ষিণের বারান্দায়। চট করে সে ঢুকে গেল হল-কামরায়। ডাইনিং হল-এ একটা মোমবাতি জ্বলছে। মাঝের পর্দাটা টানা: তাই ড্রইংরুমটা আলো-আঁধারি। অরূপ কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। প্রায় হাতরাতে হাতরাতে সে সরে এল ড্রইংরুমের উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে। বসল গিয়ে পিয়ানোর টুলে।

গান যখন অন্তরায় পৌঁছালো তখন পিয়ানোর মিঠে আওয়াজ যুক্ত হল কণ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গে। সমের মাথায় একবার থামলেন রাণী দেবী। কান পেতে কী শুনলেন। বুঝে নিলেন—পিয়ানো বাজছে। চুপ করে রইলেন পুরো একটি কলি। পিয়ানো বেজে গেল শুধু। তারপর যুক্ত হল যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গে কণ্ঠ-সঙ্গীত। রাণী দেবী নিশ্চয় বুঝে উঠতে পারেননি কে এমন আচমকা সঙ্গত করতে বসেছে—কিন্তু এটুকু বুঝে নিয়েছিলেন যে সঙ্গতকার একজন দক্ষ যন্ত্রশিল্পী।

"কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে ফিরি আমি কাহার পিছে
সব কিছু মোর হারিয়েছে পাইনি তাহার দাম।"

কৌশিক সচকিত হয়ে ওঠে। সঙ্গীতের আকর্ষণে সে নেমে আসে মই বেয়ে। এসে নামে দোতলার বারান্দায়। সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওর নজরে পড়ল দক্ষিণের বারান্দার ও-প্রান্তে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, মনে হল স্ত্রীলোক। কাবেরীই হবে নিশ্চয়। ঠিক তার ঘরের সামনেই। কৌশিক একটু ইতস্তত করে। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে যায় একতলায়।

সঙ্গীতের আকর্ষণে সস্ত্রীক সেনও উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন উত্তরের বারান্দায়।

গান শেষ হল। সঙ্গীতমগ্না দ্বিতীয়বার শুরু করলেন 'স্থায়ী'টা :

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম"

ড্রইংরুমের ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বেজে তেত্রিশ।

হঠাৎ সমস্ত বাড়ি সচকিত করে একটা ফায়ারিং-এর শব্দ হল ড্রইংরুমে!

তৎক্ষণাৎ কে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল ডাইনিং হল-এর মোমবাতিটা!

একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ। ঐ সঙ্গে ভেঙে পড়ল একটা ফুলদানি। বিশ থেকে ত্রিশ সেকেণ্ড। বাড়ি শুদ্ধ সবাই এসে উপস্থিত হল ড্রইংরুমে। প্রায় একসঙ্গেই।

অরূপরতন পড়ে আছে উবুড় হয়ে। তার পাশেই একটা ভাঙা ফুলদানি আর কিছু ছড়ানো ছিটানো গ্ল্যাডিওলাই। ডক্টর সেন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কৌশিক তার হাতের টর্চটা জ্বালল। ডক্টর সেন মুখ তুলে বললেন, থ্যাংক গড। গুলিটা কাঁধে লেগেছে। ফেটাল নয় বোধহয়!

এতক্ষণে সুবীর এসে পৌঁছালো তার বাথরুম থেকে। তার গায়ে একটা তোয়ালের তৈরী ড্রেসিং গাউন। তার চুল বেয়ে জল ঝরছে। বললে—পাশেই দু-নম্বর ঘর। ওখানেই ওঁকে নিয়ে যাওয়া যাক।

ধরা-ধার করে অচৈতন্য অরূপকে ওরা নিয়ে গেল বাসু-সাহেবের ঘরে।

ডক্টর সেন একেবারে অন্য মানুষ। সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। সুজাতাকে গরম জল আনতে বললেন। আর সবাইকে বললেন, প্লীজ ক্লিয়ার আউট। ঘর ফাঁকা করে দিন। স্ত্রীকে বলেন, আমার ডাক্তারী ব্যাগটা নিয়ে এস চট্ করে।

মিসেস সেন ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন, কী দরকার বাপু ওসব খুন-জখমের মধ্যে নাক গলাবার? তুমি চলে এস!

: সাট আপ !!—গর্জন করে উঠেন ডক্টর সেন। তারপর কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, আমার ব্যাগটা প্লীজ—

হ্যাঁ, ডাক্তার সেন মূহুর্তে বদলে গেছেন।

বারান্দার ওপ্রান্তে ইজিচেয়ারে গিয়ে বসেছিলেন ফের বাসু সাহেব। সুবীর গট গট করে এগিয়ে আসে তাঁর কাছে। কঠিন স্বরে বলেন, আপনিই এজন্য দায়ী !

: আমি ! কেন ? কি করে ?

ঃ কেন তখন সব কথা খুলে বললেন না ? হয় তো এ দুর্ঘটনা রোখা যেত !

বাসু-সাহেব বেদনাহত দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না।

দুম দুম করে পা ফেলে সুবীর চলে গেল আবার।

রাণী দেবী হুইল-চেয়ারটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। সহানুভূতির সুরে বললেন, এ দুর্ঘটনা এড়ানো যেত, তাই নয় !

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেন বাসু-সাহেব ঃ ইয়েস, ইটস্ মাই মিস্টেক! আমি ভেবেছিলাম—আমিই বুঝি ওর টার্গেট ! তাই প্রস্তুত হয়েই বসেছিলাম আমি। বুঝতে পারিনি ও অরূপকে—

পকেট থেকে একটা ছোট্ট কালো যন্ত্র বার করে দেখালেন স্ত্রীকে।

রাণী দেবী স্তম্ভিত হ'য়ে যান।

আধ ঘণ্টা পরে বাসু-সাহেব এসে দাঁড়ালেন রোগীর শিয়রে। অরূপের কাঁধের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অরূপ তখনও অচৈতন্য। প্রশ্ন করলেন ডক্টর সেনকে—কী বুঝছেন ?

ঃ বুলেটটা স্ক্যাপুলার খাঁজে আটকে আছে। বার করে দেওয়া দরকার—

ঃ হাসপাতালের অপারেসান থিয়েটার ছাড়া সম্ভব হবে ?

ঃ অসম্ভব ! থাক, আপাতত বুলেটা থাক। শকটা কাটিয়ে

উঠুন। বেঁচে যাবেন। অন্তত মেডিকেল-সায়েন্স এক্ষেত্রে যতটুকু করতে পারে তা আমি করব। নিশ্চিন্ত থাকুন।

: থ্যাংক্স!

অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে এল সুবীর। বললে, কিছু মনে করবেন না ডক্টর সেন। আমি কয়েকটা খোলা কথা বলব। অরূপবাবুকে কে গুলি করেছে তা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের মধ্যেই কেউ একজন তা করেছে—ইয়েস! এনি ওয়ান! আপনি আমিও হতে পারি!

: সো হোয়াট?—রুখে ওঠেন ডক্টর সেন।

: আপনি ওঁকে কী ওষুধ দিচ্ছেন, কী ইনজেক্‌সান দিচ্ছেন সব একটা স্টেটমেন্টের আকারে লিখে যাবেন এবং মিসেস বাসুকে দেখিয়ে ওষুধ খাওয়াবেন, ইনজেক্‌সান দেবেন—

: মিসেস্ বাসুকে! কেন? উনি কী বোঝেন ডাক্তারীর?

: সে জন্য নয়। একমাত্র মিসেস্ বাসুই সন্দেহের অতীত।

ডাক্তার সেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, ইয়েস ডক্টর সেন। টেক মাই লীগাল এ্যাড-ভাইস। সুবীর যা বলছে তাই করুন। মেডিক্যাল-সায়েন্সে যতখানি সম্ভব আপনি করুন—ক্রিমিনাল জুরিসপ্রুডেন্সে যতখানি সম্ভব আমাকে করতে দিন—

শ্রাগ করলেন ডাক্তার সেন: এ্যাস য়ু প্লীস্!

সাত

পরদিন চৌঠা অক্টোবর। শুক্রবার। সকাল।

সুবীরের ঘরে এসে হাজির হল আলি। পর্দার বাইরে থেকে বললে, ভিতরে আসতে পারি ?

সুবীর একটু অবাক হল, বললে, নিশ্চয়। আসুন মিস্টার আলি! কী ব্যাপার ?

আলি এসে বসল সামনের চেয়ারটায়। বললে, আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে এলাম।

: বলুন ?—ঘনিয়ে আসে সুবীর।

: দেখুন মিস্টার রায়, আপনি কাল যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন আমি জোভিয়াল-মুডে জবাব দিয়েছিলাম। সত্যিকথা বলতে কি আমি বিশ্বাস করিনি যে, দার্জিলিঙ-এর ঘটনা এই রিপোস্-এ রিপিটেড হতে যাচ্ছে—ভেবেছিলাম এসব আপনাদের আষাঢ়ে কল্পনা। কিন্তু এখন আর সেটা ভাবা যাচ্ছে না। দু-নম্বর ঘটনা এখানে কাল রাত্রে ঘটে গেছে। ফলে এখন সিরিয়াসলি ব্যাপারটা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই—

: করুন। আমি কর্ণময়!

: প্রথম কথাই বলব যে, আমি জানি—আমি নিজে আপনার সন্দেহের তালিকায় আছি। আই নো ইট! শুধু আমি নই, আপনি হয়তো ডক্টর সেন এমনকি বৃদ্ধ অজয়বাবুকেও সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন; মিস্ ডিক্রুজার সন্ধানে আপনি কাবেরী দেবী অথবা মিসেস্ সেনকেও নজরে নজরে রেখেছেন—তাই নয় ?

: বলে জান—

: আমার আশঙ্কা হচ্ছে আপনি—এ কেস-এর ইনভেস্টিগেটিং

অফিসার—সমস্ত সম্ভাবনা তলিয়ে দেখছেন না, ফলে আপনার সন্দিগ্ধের তালিকা থেকে একজন বাদ যাচ্ছেন, যাঁকে ঠিকমত বাজিয়ে দেখা আপনার উচিত। আপনারা কয়েকটি ভুল পূর্বসিদ্ধান্ত করেছেন !

: আর একটু পরিষ্কার করে বলুন—

: আপনারা ধরে নিয়েছেন—পয়লা অক্টোবর ইব্রাহিম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশান থেকে শেয়ারের ট্যাক্সি চেপে রমেন দারোগা আর মিস্ ডিক্রুজার সঙ্গে দার্জিলিঙ-এ এসেছিল। তা তো না-ও হতে পারে ? এমনও তো হতে পারে যে, রমেনবাবু আর মিস্ ডিক্রুজা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শেয়ারের ট্যাক্সিতে আসছিল আর ইব্রাহিম মাঝপথে ঐ ট্যাক্সিতে ওঠে, ধরুন পাঙ্খাবাড়ি, কাশিয়াঙ, সোনাদা কিম্বা এই ঘুম-এই।

: এমনটা মনে করার হেতু ?

: আপনাদের ধারণা যে, এই ট্যাক্সিতে আসার সময়েই রমেনবাবু আর মিস্ ডিক্রুজার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়—সেটা এতদূর নিবিড় হয় যাতে হোটেলে পৌঁছেই রমেনবাবু ডুপ্লিকেট চাবিটা চেয়ে নেয় এবং ডিক্রুজাকে সেটা দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে স্বতই ধরে নিতে হয় ট্যাক্সিতে দুজন বেশ কিছুক্ষণ নিভৃত আলাপের সুযোগ পেয়েছিল। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে দুটি পুরুষ ও একটি মহিলা একসঙ্গে রওনা হলে এ জাতীয় ঘনিষ্ঠতা কখনো গড়ে উঠতে পারে দুজনের মধ্যে ?

: সো হোয়াট ?

: তাতে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইব্রাহিম পয়লা তারিখ সকালে ঐ ট্রেনে কলকাতা থেকে আসেনি। সে মাঝ রাস্তায় ঐ ট্যাক্সিতে উঠেছিল—

সুবীর বলে, কিন্তু মুশকিল কি হচ্ছে জানেন মিস্টার আলি—আমাদের সন্দেহের তালিকায় যে কজন আছেন, যেমন ধরুন ডক্টর সেন, অজয়বাবু এবং—

: আপনার ইতস্তত করার কিছু নেই—আমরা এ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশান করছি, ফলে 'এবং মিস্টার আলি'! আমি নিজেকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেবার শুভেচ্ছা নিয়ে আপনার কাছে আসিনি; আমি শুধু বলতে এসেছি যে, সমস্যাটার আরও একটা দিক আছে, আরও একজনকে সন্দেহের তালিকায় আপনাদের রাখা উচিত।

: আর একটু স্পেসিফিকালি বলবেন?

: বলব। আমি এখানে এসে পৌঁছাই পয়লা তারিখ রাত সওয়া ন'টায়। তখন এখানে মিসেস মিত্র একা ছিলেন। মিস্টার কৌশিক মিত্র ফিরে এলেন রাত দশটায় এবং এসেই তাঁর স্ত্রীকে কৈফিয়ৎ দিলেন যে, তিনি সমস্ত দিন ছিলেন কাঞ্চন ডেয়ারিতে. দার্জিলিঙ-এ তিনি আদৌ যাননি সারাটা দিন—

: তাতে কি হল?

: অথচ আমি নিশ্চিত জানি—কৌশিকবাবু বেলা এগারোটার সময় ঘুম স্টেশানে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে চেপে দার্জিলিঙ এ যান। সারাটা দিন তিনি দার্জিলিঙ-এ কি করেছেন তা জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে, তিনি দুপুরে 'সংগ্রি-লা' নামে একটি চীনা হোটেলে লাঞ্চ করেন—একা নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন একটি সুন্দরী মহিলা।

: মহিলা! কে তিনি?

: এ কাহিনীর মিসিং লিংক। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। চুল ছোট, বব নয়। চেহারায় অবাঙালিত্বের ছাপ; কিন্তু চমৎকার বাঙলা বলতে পারেন। মহিলাটি কে হতে পারেন তা মিসেস্ মিত্র আন্দাজ করতে পারছেন না, অথচ আমি স্বচক্ষে দেখেছি কৌশিকবাবু তাকে একটি 'সোনার কাঁটা' উপহার দিচ্ছেন! আর—যদি না আমার চোখ ভুল করে থাকে, মহিলাটির ভাইটাল স্টাটিস্টিকস্ ঐ রকমই ৩৪-২৮-৩২!

সুবীরের ভ্রূকুঞ্চিত হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে দেখতে থাকে আলিকে। তার পর বলে, আপনি কেমন করে জানলেন ?

: আমি প্রত্যক্ষদর্শী। তিন টেবিল পিছনে আমি ঐ রেস্তোরাঁতেই খাচ্ছিলাম। একা। ফলে কৌশিকবাবু আমাকে নজর করেননি। আর সুন্দরী সঙ্গিনী থাকায় আমি বার বার ওদিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম।

সুবীর বললে, এ্যাকাডেমিক ডিস্‌কাশানই যখন করছি তখন বলি—এমনও তো হতে পারে যে, আপনি আদ্যন্ত বানিয়ে বলছেন। আমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত করতে।

: কারেক্ট! সেটাও যেমন সম্ভব তেমনি এটাও সম্ভব যে, আমি আদ্যন্ত সত্যকথা বলছি। আমি কোনভাবেই আপনার তদন্তকে প্রভাবিত করতে চাই না। আমি শুধু একথা বলব যে, আমি তদন্তকারী অফিসার হলে এটার সত্যতা যাচাই করে দেখতাম। সত্য হলে কৌশিককে সন্দেহ করতাম, আর মিথ্যা হলে আলিকে আরও সন্দেহের চোখে দেখতাম।

সুবীর বললে—থ্যাংক্‌স, ফর দ্য টিপস্‌!

আরও আধঘণ্টা পরের কথা। সুবীর এসে উপস্থিত হল কৌশিকের ঘরে। বললে, কৌশিকবাবু এতক্ষণ আপনাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়নি, এখন আপনার স্টেটমেণ্টটা নিতে চাই—

কৌশিক কি একটা হিসাব লিখছিল। খাতাটা বন্ধ করে বললে, বলুন ?

: ঐ পয়লা তারিখ আপনি কোথায় ছিলেন ? সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ?

কৌশিক চট করে জবাব দেয় না। প্রতিপ্রশ্ন করে, কেন বলুন তো ?

: আমি যদি বলি ঐদিন বেলা এগারটা নাগাদ আপনি ঘুম স্টেশান থেকে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি নিয়ে দার্জিলিঙ গিয়ে-

ছিলেন, সারাদিন দার্জিলিঙ-এই ছিলেন এবং সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে মিসেস্ মিত্রকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন—আপনি কি অস্বীকার করবেন্ ?

এবারও সরাসরি জবাব দেয় না কৌশিক। বলে, কে বলেছে আপনাকে ? সুজাতা ?

: কে আমাকে বলেছে সেটা বড় কথা নয়। আপনি আমার প্রশ্নের জবাবটা দেননি এখনও ?

কৌশিক তবুও সহজ হতে পারে না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আপনার অভিযোগ সত্য।

: আপনি দুপুরে সাংগ্রি-লাতে লাঞ্চ করেন। আপনার সঙ্গে একটি মহিলা আহার করেছিলেন—সুন্দরী। চমৎকার ফিগার। অবাঙালী অথচ তিনি চমৎকার বাঙলা বলতে পারেন। ট্রু ?

রীতিমত চমকে উঠে কৌশিক। বলে, আপনি কী বলতে চান ? আমি·· আমি রমেন দারোগাকে খুন করেছি ?

: আমি কিছু বলতে চাই না কৌশিকবাবু। বললেন তো আপনি। আমি যা বলছি তা সত্য ?

কৌশিক রুখে ওঠে, হ্যাঁ সত্য ! সো হোয়াট ?

: সেই মহিলাটি কে ?

: আমি বলব না !

: আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না।

: বেশ তাই ! তারপর ?

সুবীর উঠে দাঁড়ায়। বলে, না, তারপর আর কিছু নেই। ধন্যবাদ।

নিঃশব্দে উঠে চলে যায় সুবীর।

কৌশিকও উঠে পড়ে। তার মনে হয়—এর মূলে আছে সুজাতা। কিন্তু সুজাতা কেমন করে আন্দাজ করল সে কাঞ্চন ডেয়ারিতে যায়নি—গিয়েছিল দার্জিলিঙ ? সুজাতা কেমন করে জানবে সে কোথায় কার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছিল ? পায়ে পায়ে ও চলে আসে

কিচেন-ব্লকে। ব্যাপারটার ফয়শালা হওয়া দরকার। কেমন করে সুজাতা জানতে পারল এ কথা ?

কিচেন-ব্লকে পর্দার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল ওকে। ঘরের ভিতর দুজনে নিম্নস্বরে কথা বলছে। একজন সুজাতা, দ্বিতীয়-জন কে ? পুরুষকণ্ঠ! ভদ্রলোক তখন বলছিলেন, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন সুজাতা দেবী, আমি তেমন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ও প্রশ্ন করিনি।

: তাহলে আমাদের বিবাহিত জীবন নিয়ে আপনার অত কৌতূহল কেন ?

: কী আশ্চর্য! আপনি অফেণ্ডেড্ হচ্ছেন কেন? আমি শুধু জানতে চাইছি এ্যারেঞ্জড ম্যারেজ যখন হয়নি তখন কতদিন ধরে আপনি কৌশিকবাবুকে চেনেন। এতে অফেন্স নেবার কি আছে ?

: অফেন্স নিচ্ছি প্রশ্নটার জন্য নয়, তার পিছনে যে ইঙ্গিতটা আছে সেটায়! হ্যাঁ, আপনি যা জানতে চাইছেন তা ঠিক। মিস্টার মিত্র একবার মার্ডার কেসে এ্যারেস্টেড হয়েছিলেন, ঐ রমেনবাবুই তাকে গ্রেপ্তার করেন। খবরটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানি না, কিন্তু সংবাদটা অসমাপ্ত—ঐ সঙ্গে এটুকুও জেনে রাখুন আমিও ঐ কেসে মার্ডার চার্জে এ্যারেস্টেড হয়েছিলাম! কিন্তু প্লিজ মিস্টার আলি, এসব আলোচনা আপনার সঙ্গে আমি করতে চাই না! আপনি এবার আসুন। আমাকে কাজ করতে দিন। আর···কিছু মনে করবেন না, এ কিচেন-ব্লকটা বোর্ডারদের জন্য নয়, এটা হোটেলের প্রাইভেট অংশ। আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হলে কাঞ্চীকে দিয়ে খবর পাঠাবেন দয়া করে—

কৌশিক নিঃশব্দচরণে ফিরে যায় নিজের ঘরে।

আরও আট দশ ঘণ্টা কেটে গেছে তারপর। সময় যেন থমকে আছে ঐ অভিশপ্ত বাড়িটায়—যেখানে নূতন জীবনের সূত্রপাত করতে

সদ্য-বিবাহিত একটি দম্পতি আনন্দের আয়োজন করেছিল। না। ভুল বললাম। সময় থমকে নেই। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সময় বয়ে চলেছে—ড্রইংরুমের পেণ্ডুলাম-ওয়ালা ঘড়িটায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। আর শোনা যায় নিরবচ্ছিন্ন ধারাপাতের শব্দে। বৃষ্টি এখনও পড়ছে—কখনও জোরে, কখনও ঝড়ো-হাওয়ার ক্ষ্যাপামিতে, কখনও বা ইল্‌সে-গুড়ির নৈঃশব্দে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। টেলিফোন যোগাযোগ নেই, ইলেকট্রিক কারেণ্ট নেই—স্তব্ধ হয়েছে কার্ট-রোড দিয়ে গাড়ির আনাগোনা। কোথাও কোনও মানুষজনের সাড়া শব্দ নেই। এমন কি পাখিটা পর্যন্ত ডাকছে না।

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বেষ্টনীতে জাহাজ-ডুবির কজন যাত্রী আশ্রয় নিয়েছে জনমানবশূন্য একটা ছোট্ট দ্বীপে। সংখ্যায় ওরা মাত্র দশজন। চারদিকেই উত্তালতরঙ্গ সমুদ্রের লবনাক্ত বেড়াজাল—পালাবার কোন পথ নেই। ওদের মুক্তির একমাত্র উপায় হয়তো ছিল—সঙ্ঘ-বদ্ধতায়। বিশ্বাসে, পারস্পরিক সৌহার্দ্যে। অথচ এমনই দুর্ভাগ্য ওদের—ওরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভদ্রতা বজায় রেখে একসঙ্গে হাসছে, কথা বলছে, খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে—অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দেহ করছে। ওরা জানে—ওদের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে একজন নৃশংস খুনী—জাত ক্রিমিনাল। ওদেরই মধ্যে একজনকে খুন করবার জন্য সে অবকাশ খুঁজছে। কে কাকে? তা ওরা জানে না; কিন্তু ভুলতেও পারছে না সেই মারাত্মক তিন নম্বরের জিজ্ঞাসা চিহ্নটিকে।

কৌশিক ওর ঘরে চুপ করে বসেছিল। জানালা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে ধারাস্নাত পাইন গাছগুলোর দিকে। সুজাতা ঘরেই আছে। কথাবার্তা হচ্ছে না ওদের। মন খুলে কেউ যেন কিছু বলতে পারছে না এ ক'দিন। এমনিই হয়! প্রেমের ফুল যখন ফোটে তখন কুন্দর মত সুন্দর হয়ে ফোটে; আর প্রেমের কাঁটা যখন ফোটে তখন শজারুর কাঁটার মত সর্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। শজারুর কাঁটা না

সোনার কাঁটা ? শেষে কী মনে করে সুজাতা এগিয়ে এল পিছন থেকে। আলতো করে একখানা হাত রাখল কৌশিকের কাঁধে। কৌশিক ফিরে তাকালো না। সুজাতার হাতের উপর হাতটা রাখল।

: একটা কথা সত্যি করে বলবে ?

এবারও মুখ ঘোরালো না কৌশিক। একইভাবে বসে বলে, বল ?

: তুমি পয়লা-তারিখ কাঞ্চন-ডেয়ারিতে যাওনি, নয় ?

: যাইনি !

: দার্জিলিঙে গিয়েছিলে ?

: হুঁ !

: সেখানে সাংগ্রি-লাতে দুপুরে লাঞ্চ করেছিলে ?

: হুঁ !

: তোমার সঙ্গে একটি মেয়ে খেয়েছিল। সে কে ?

কৌশিক নিরাসক্ত ভাবে বললে, প্রমীলা ডালমিয়া। আমার সহপাঠী কিশোর ডালমিয়ার স্ত্রী। সাংগ্রি-লাতেই হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।

সুজাতা এক মুহূর্ত কী ভেবে নেয়। তারপর ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলে, তাহলে সেদিন কেন মিছে কথা বললে আমায় ?

কৌশিক ম্লান হাসে। এতক্ষণে ওর দিকে ফিরে বললে, একটা ব্যাপার তোমার কাছে থেকে গোপন করতে—

: কী ব্যাপার ?

: তোমার জন্য একটা জিনিস কিনতে দার্জিলিঙ গিয়েছিলাম।

: জিনিস ? কী জিনিস ?

অন্যমনস্কের মত পকেট থেকে একটা গহনার কেস বার করে কৌশিক টেবিলের উপর রাখে। সুজাতা সেটা খুলে দেখে না। বলে, হঠাৎ গহনা কেন ?

শূন্যের দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলে, কাল তোমাকে উপহার দেব ভেবেছিলাম। কাল পাঁচই অক্টোবর।

উদাসীনের মত সুজাতা বললে, ও হ্যাঁ। ভুলেই গেছিলাম।

হঠাৎ পর্দার বাইরে থেকে কে যেন বললে, ভিতরে আসতে পারি ?

কৌশিক প্যাকেটটা আবার পকেটে ভরে নিয়ে বলে, আসুন—

ঘরে ঢোকে সুবীর। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলে, ব্যাড লাক ! ঘুম-অঞ্চলের সমস্ত টেলিফোন বিকল। দার্জিলিঙ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না।

: তাহলে ?

: না, ব্যবস্থা একটা হয়েছে। ঘুম আউটপোস্ট থেকে একজন বিশেষ সংবাদবহ পাকদণ্ডী পথে আমার চিঠি নিয়ে এই বৃষ্টি মাথায় করেই দার্জিলিঙে চলে গেছে। আজ রাত্রের মধ্যেই সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে ও-সি মিস্টার ঘোষাল হয়তো নিজেই এসে পড়বেন।

সুজাতা প্রশ্ন করে, আপনি কি কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না ?

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে সুবীর বলে, এখনও ডেফিনিট হতে পারিনি। ইব্রাহিম যদি সহদেব স্বয়ং হয় তবে মিস্টার আলী অথবা ডক্টর সেনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। আর ইব্রাহিম-ডিক্রুজা যদি 'পার্টনার-ইন-ক্রাইম হয় তাহলে ডক্টর এ্যাণ্ড মিসেস্ সেন অথবা আলি-কাবেরী গ্রুপকে সন্দেহ করতে হয়। অজয়বাবু একটু রগচটা প্রকৃতির—কিন্তু তাঁকে সন্দেহ করার কোন কারণ দেখছি না। আচ্ছা, ভাল কথা—বাসু-সাহেব আমাকে বলেছেন যে তিনি ইব্রাহিম আর ডিক্রুজাকে নিশ্চিতভাবে স্পট করেছেন। আপনাদের কিছু বলেছেন তিনি ?

সুজাতা বলে, বাসু-সাহেব কখন কি ভাবছেন বোঝা মুশকিল ; কিন্তু উনি আমার সাহায্যে একটা ছোট্ট তদন্ত করিয়েছিলেন—

: কী তদন্ত ?

: কাবেরী দেবীর ঘরের এ্যাসট্রেটা আমাকে দিয়ে আনিয়ে উনি কী-যেন পরীক্ষা করেন।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সুবীর। একটানে পর্দাটা সরিয়ে দেয়। দেখা গেল পর্দার ও পাশে ডক্টর সেন দাঁড়িয়ে ছিলেন। থতমত খেয়ে ডক্টর সেন বলেন, ইয়ে, আজ আর থার্ড কাপ চা পাওয়া যাবে না, নয় মিসেস্ মিত্র?

ভ্রূকুঞ্চিত করে সুজাতা বললে, চা-য়ের সন্ধানে এখানে?

: না, মানে রান্নাঘরে আপনাকে দেখতে না পেয়ে—

: আসুন।—সুজাতা ডক্টর সেনকে নিয়ে নিচে নেমে গেল।

ও. সি. দার্জিলিঙের উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল অন্য একটি কারণে:

কালরাত্রেই সুবীর জানতে চেয়েছিল আসামীদের মধ্যে কার কার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। বাসু-সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করেছিলেন তাঁর কাছে আছে।

সুবীর প্রশ্ন করে, অরূপরতন যখন গুলিবিদ্ধ হয় তখন রিভলভারটা কোথায় ছিল?

: আমার ডান হাতে। আমি রিভলভারটা হাতে নিয়ে বসেছিলাম ঐ ইজিচেয়ারে। পশ্চিমমুখো—

ভ্রূকুঞ্চিত হয়েছিল সুবীরের। বলেছিল, কেন? রিভলভার হাতে বসেছিলেন কেন?

: এমন প্রিমনিশান হয়েছিল আমার। মনে হচ্ছিল এখনই এই মুহূর্তেই একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। আমি সহদেবের প্রতীক্ষা করছিলাম।

বাসু একে একে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখেন—আলি, অজয় ডাক্তার সেন, কৌশিক—সকলেই পাথরের মূর্তি। সুবীর বললে, আপনার রিভলভারটা দেখি?

অম্লানবদনে বাসুসাহেব হস্তান্তরিত করলেন আগ্নেয়াস্ত্রটা। বললেন ওটা লোডেড। সুবীর সেটা শুঁকে দেখল। চেম্বারটা খুলে কী যেন দেখল। যন্ত্রটার নম্বর নোটবুকে টুকে নিয়ে ফেরত দিল

সেটা। তারপর এদিকে ফিরে বললে, আর কার কাছে রিভলভার আছে?

কেউ জবাব দেয়নি।

: এ-ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে প্রত্যেকের মালপত্র আমাকে সার্চ করতে হবে।

প্রতিবাদ করেছিলেন অজয় চট্টোপাধ্যায়। বলেছিলেন, আগে থানা থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট করিয়া আমুন তারপর আমার বাক্স ঘাঁটবেন। তার আগে নয়।

: কেন? আমি তো প্রত্যেকের বাক্সই সার্চ করতে চাইছি। আর কেউ তো তাতে আপত্তি করছেন না। আপনি একাই বা কেন—

: করছি। আমারও আপত্তি আছে।—বলেছিল আলি।

বাসু-সাহেব বলেছিলেন—সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া তুমি হোটেল তল্লাসী করতে পার না।

গুম মেরে গিয়েছিল সুধীর। আলি হেসে বলেছিল, অর্থাৎ অবজেকশান সাসটেইণ্ড।

তাই সকালে উঠেই সুধীর চলে গিয়েছিল ঘুম-আউটপোস্ট-এ। সেখানে গিয়ে জানতে পারে ঘুম অঞ্চলের সমস্ত টেলিফোন বিকল। বাধ্য হয়ে সে নাকি দার্জিলিঙে স্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠিয়েছে। রাত্রের মধ্যেই ও. সি. দার্জিলিঙ এসে যাবেন। সার্চ ওয়ারেন্ট আসবে। আর হয়তো কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের রুম সার্ভিসের বেয়ারা বীর-বাহাদুর। যে রিপোস-এর আবাসিকদের দর্শনমাত্র বলে দিতে পারে মহম্মদ ইব্রাহিম অথবা ডিক্রুজা এখানে আছে কি না।

সন্ধ্যাবেলায় সুধীর রায়ের আহ্বানে সকলে সমবেত হলেন ড্রইংরুমে। সুধীর নাকি সকলকে সম্বোধন করে কিছু জানতে চায়। সবাই এসে গুটি গুটি বসেছে ড্রইংরুমে।

দিনের আলো নিবে গেছে। গোটা তিনচার মোমবাতি জ্বলছে

ঘরের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে। এলোমেলো হাওয়ায় মোমবাতির শিখা কাঁপছে। সেইসঙ্গে কাঁপছে আতঙ্কতাড়িত আবাসিকদের অতিকায় ছায়া-মিছিল।

গলাটা সাফা করে নিয়ে সুবীর বললে, অপ্রিয় সত্যটা অস্বীকার করে লাভ নেই—আমাদের মধ্যেই একজন আছেন যিনি মিস্টার মহাপাত্রের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। রমেনবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করা যায় কিনা সে কথা ঠিক এখনই বলা যাচ্ছে না ; কিন্তু অরূপ মহাপাত্রকে যে লোকটা পিছন থেকে গুলিবিদ্ধ করে সে এখন বসে আছে এই ঘরেই। আমাদের মধ্যে আত্মগোপন করে। এ যুক্তিতে আপত্তি আছে কারও ?

কেউ কোন জবাব দেয় না।

সুবীর পুনরায় বলে, আপনারা এ যুক্তি মেনে নিলেন। এবার আরও স্পেসিফিক্যালি বলি : আমরা দশ-বারো জন আছি, তার মধ্যে মিসেস বাসুকে আমরা বাদ দিতে পারি। কারণ তাঁর এ্যালে-বাঈ পাকাপোক্ত। তিনি নিজের ঘরে বসে গান গাইছিলেন—সে গান আমরা সবাই শুনেছি. গুলির শব্দের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত—ওয়েল. আর যুক্তির প্রয়োজন নেই,—মিসেস বাসু অনারেবলি এ্যাকুইটেড। এগ্রীড ?

এবারও কেউ কোন সাড়া দিল না।

: তাহলে বাকি রইলাম আমরা ন-জন। আসুন, এবার আমরা বিচার করে দেখি। এই নয়জন ঘটনার মুহূর্তে কে কোথায় ছিলেন ; কারও কোনও এ্যালেবাঈ আছে কিনা। একে একে আপনারা বলুন—

: নয়জন বলতে ? প্রশ্ন করেন অজয়বাবু।

: মিস্টার কৌশিক মিত্র, মিসেস মিত্র, ডক্টর এ্যাণ্ড মিসেস সেন, মিস্টার অজয় চ্যাটার্জি, কাবেরী দেবী, মিস্টার আলি, মিস্টার বাসু এবং কালিপদ।

: এ্যাণ্ড হোয়াই নট মিস্টার সুবীর রয়?—প্রশ্নটা অজয় চাটুজ্জের।

: আলি উৎফুল্ল হয়ে বলে, পার্টিনেণ্ট কোশ্চেন। হিন্দু-দর্শনে দশমস্তমসি বলে একটা কথা আছে না?

সুধীর হেসে বলে, আছে। বেশ, আমরা দশজন। আমিই বা বাদ যাই কেন অঙ্কের হিসাব থেকে, তাহলে আমিই আগে কৈফিয়ৎটা দিই: আমি ছিলাম বাথরুমে। হট বাথ নিচ্ছিলাম। গান আমি শুনতে পাইনি, তবে গুলির শব্দটা শুনেছি। জামাকাপড় পরে বের হয়ে আসতে আমার মিনিট দুই দেরী হয়েছিল। আমিই বোধহয় সবার শেষে ড্রইংরুমে এসে পৌছাই। এবার আপনারা সবাই বলুন। কৌশিকবাবু?

: আমি ছিলাম ছাদে। গান শুরু হতেই শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তখন নেমে আসি।

: ছাদে! ছাদ তো ঢালু ছাদ —সুবীর প্রশ্ন করে।

: না, ঠিক ছাদে নয়, মই বেয়ে উঠে আমি রেনওয়াটার পাইপটা বন্ধ হয়ে গেছে কিনা দেখছিলাম। দোতলায় নেমে এসে দেখি—দক্ষিণের বারান্দার ও-প্রান্তে একজন মহিলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। জানিনা—তিনি কাবেরী দেবী অথবা মিসেস সেন। সুজাতা নয়, কারণ আমি তাকে মীট করি একতলায়, কিচেন-ব্লকের সামনে—

ওর বক্তব্যের সূত্র ধরে কাবেরী বলে ওঠে, ওখানে আমিই দাঁড়িয়েছিলাম। গান শুনছিলাম। আমি কৌশিকবাবুকে নেমে আসতে দেখেছিলাম। কৌশিকবাবুই কি না হলপ করে বলতে পারব না। কারণ আলো ছিল খুব কম। একজন পুরুষ মানুষকে বর্ষাতি গায়ে এবং টর্চ হাতে দেখেছিলাম মাত্র।

ডক্টর সেন বলেন, অর্থাৎ আপনারা দুজন দুজনের এ্যালেবাঈ। কেমন?

আলি বলে ওঠেন, ব্যারিস্টার-সাহেব কি বলেন? ওঁরা তো

কেউ কাউকে চিনতে পারেননি। ইনি দেখেন নারী মূর্তি, উনি দেখেছেন পুরুষ মূর্তি! তাতে কী প্রমাণ হয়?

বাধা দিয়ে সুবীর বলে, সে বিশ্লেষণ থাক। আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

: নিজের ঘরে। একটা ডিটেকটিভ গল্প পড়ছিলাম। আগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপ'।

: অর্থাৎ আপনার কোন এ্যালেবাঈ নেই?

: আগাথা ক্রিস্টি আমার এ্যালেবাঈ!

অজয় চট্টোপাধ্যায় চটে উঠে বলেন, এই কি আপনার রসিকতা করবার সময়?

: কেন নয়? আমরা তো এসেছি বেড়াতে, ফুর্তি করতে, পাহাড় দেখতে, তাই নয়?

সুবীর অজয় বাবুকে প্রশ্ন করে, আপনি কোথায় ছিলেন?

: কে আমি?—সচকিত হয়ে ওঠেন অজয় চাটুজ্জে। তারপর সামলে নিয়ে বলেন, আমি ইয়ে, আহ্নিক করছিলাম।

: আহ্নিক! মানে?—প্রশ্ন করে সুবীর রায়?

আবার চটে ওঠেন অজয়বাবু: আপনি হিন্দুর ছেলে, তাই আহ্নিক বোঝেন না। আলি-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবেন, উনি বুঝিয়ে দেবেন সন্ধ্যাহ্নিক বলতে কি বোঝায়!

সুবীর এ বক্রোক্তি গলাধঃকরণ করে ডাক্তার সেনকে বলে, আপনি কি বলেন?

: ঐ সন্ধ্যাহ্নিক বিষয়ে?—জানতে চান ডক্টর সেন।

ধমক দিয়ে ওঠে সুবীর: আজ্ঞে না। আপনারা দুজন তখন কোথায় ছিলেন?

: তাস খেলছিলাম। উনি আর আমি। আমরা দুজন দুজনের এ্যালেবাঈ।

আলি হেসে ওঠে: অবজেকসান য়োর অনার! স্বামী-স্ত্রী

দুজনেই সাস্‌পেক্‌টেড। এক্ষেত্রে কি ওঁরা পরস্পরের এ্যালবাঈ হতে পারেন ?

মিসেস্ সেন চীৎকার করে ওঠেন, সাস্‌পেক্‌টেড মানে ? হাউ ডেয়ার য়ু—

সুবীর তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ব্যারিস্টার-সাহেব কাউকে কিছু প্রশ্ন করবেন ?

বাসু-সাহেব বলেন, হ্যাঁ করব। তোমাকেই করব। আজ রাত্রে কি নৃপেন এখানে এসে পৌঁছতে পারবে ?

ঃ তাই তো আশা করছি।

ঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের বেহারা বীর বাহাদুরও কি আসবে ?

ঃ হ্যাঁ, আসবে ! আমাদের মধ্যে ইব্রাহিম অথবা মিস্ ডিক্রুজা আছে কিনা সেটা আজ রাত্রেই জানা যাবে। - বলেই সুবীর একে একে সকলের দিকে তাকায়। এ ঘোষণায় শ্রোতৃবৃন্দের কার মুখে কী অভিব্যক্তি হচ্ছে জেনে নিতে চায় ! তারপর সে আবার বলে, আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এবার আমার একটি প্রস্তাব আছে। আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। আশা করি সকলের সহযোগিতা পাব।

ঃ কী জাতের পরীক্ষা ?—জানতে চান অজয়বাবু।

জবাবে সুবীর বলে, একটা কথা তো মানবেন যে, আমাদের মধ্যে অন্তত একজন মিথ্যা কথা বলেছেন ! ঘটনার মুহূর্তে তিনি বাস্তবে ছিলেন অরূপবাবুর পিছনে ! তিনি কে, তা আমরা জানি না—কিন্তু জানতে চাই। তাই আমার প্রস্তাব—আজ রাত ঠিক সাড়ে আটটায় আমরা প্রত্যেকে গতকালকার পজিসানে ফিরে যাব। ড্রইংরুমের ঘড়িতে সাড়ে আটটার শব্দ হতেই রাণী দেবী তাঁর ঘরে বসে ঐ গানটাই গাইবেন। আমরা এইমাত্র আমাদের জবানবন্দীতে যে কথা বলেছি ঠিক তাই তাই করে যাব আটটা তেত্রিশ পর্যন্ত ! ঠিক আটটা তেত্রিশে আমি ড্রইংরুমে একটা ব্ল্যাঙ্ক-

ফায়ার করব। আপনারা গতকালকের মত সবাই ছুটে আসবেন ড্রইংরুমে!

অজয়বাবু বলেন, তাতে কোন চতুর্বর্গলাভ হবে?

ঃ যারা সত্য কথা বলেছে, তারা গতকালকার আচরণ অনুযায়ী আজকেও কাজ করে যেতে পারবে। কিন্তু যে মিথ্যা কথা বলেছে তার ব্যাপারটা গুলিয়ে যাবেই। সে এমন একটা কিছু করে বসবে যাতে সে ধরা পড়ে যাবে। এটা ক্রাইম ডিটেকশানের একটি সাম্প্রতিক পদ্ধতি। অনেক সময়েই এতে সুফল পাওয়া গেছে। না কি বলেন, বাসু-সাহেব?

বাসু সাহেব বলেন, হতে পারে। আমি ব্যাক-ডেটেড। আমি এ পদ্ধতির কথা শুনিনি।

আলি বলে ওঠে, আমি শুনেছি মিস্টার রায়, আগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপে' ঠিক ঐ ধরণের একটা পরীক্ষার কথা আছে—

অজয়বাবু বলেন, দূর মশাই। তাই কি হয় নাকি? কাল যদি আমিই গুলি করে থাকি, তাহলে আজ কি আর সারা বাড়ী দাপাদাপি করে বেড়াবো? আজ তো গ্যাটসে নিজের ঘরে বসে সীতারাম জপ করব!

সুবীর বলে, তাই করবেন। তাহলে তো আর আপনার আপত্তি নেই?

কাবেরী বলে, তবু একটা তফাৎ হবে কিন্তু মিস্টার রায়। আজ আর গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজবে না।

ঃ বাজবে!—সুবীর ওকে আস্বস্ত করে।

ঃ বাজবে? কেমন করে? কে বাজাবে আজ?

ঃ আমি বাজাব! আমার ঘরে জলের কলটা খোলা থাকবে; কিন্তু আমি বাথরুমে থাকব না। আমি আজ অভিনয় করব অরূপরতনের চরিত্রটা। অর্থাৎ গান অন্তরায় পৌঁছালে আমি পিয়ানো বাজাতে শুরু করব। আপনি, রাণীদেবী, গত কালকের মতই এক

লাইন আমাকে 'সোলো' বাজাতে দেবেন। তারপর মিউজিকে যোগ দেবেন। কেমন ?

আলি বললে, আপনি পিয়ানো বাজাতে জানেন ?

ঃ জানি।

ঃ অত ভাল ?

ঃ রাত সাড়ে আটটায় এ প্রশ্নের জবাব পাবেন ?

আলি বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে, বুঝেছি, মহাভারতে আছে আত্মশ্লাঘা আত্মহত্যার নামান্তর !

মিসেস সেন বলেন, আপনি কথায় কথায় মহাভারত পাড়েন কেন বলুন তো ?

ঃ মহাভারত আর রামায়ণ হচ্ছে আমার প্রিয় গ্রন্থ; আর বিভীষণ হচ্ছে আমার হিরো ! মন্দোদরী বিভীষণকে নিকা করেছিল কি না ঠিক জানি না। সুজাতাদেবী বলতে পারবেন !

আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছে দেখে সুবীর বলে ওঠে, থ্যাঙ্কু অল। রাত আটটা হয়েছে। এবার তাহলে আমরা সবাই প্রস্তুত হই।

ডক্টর সেন বলেন, একটা কথা। আটটা তেত্রিশে ব্ল্যাঙ্ক-ফায়ার শুনে আমরা সবাই ছুটে আসব। তারপর ?

সুবীর জবাবে বলে, তার পরেও আপনারা কালকের আচরণ করে যাবেন। আপনারা এসে দেখবেন—আমি ঠিক ঐখানে উবুড় হয়ে পড়ে আছি। অর্থাৎ আমিই যেন অরূপবাবু। আপনি, ডক্টর সেন আমাকে পরীক্ষা করে বলবেন—থ্যাঙ্ক গড ! গুলিটা কাঁধে লেগেছে ! ফেটাল নয় !

ডক্টর সেন গম্ভীর হয়ে ঘাড় নাড়লেন।

ঃ কিন্তু একটা কথা !—সতর্ক করে দেয় সুবীর—কোন কারণেই আজ ঐ তিন মিনিটের জন্য আপনারা অন্য রকম আচরণ করবেন না। ঠিক কাল যা করেছেন, তাই করবেন। অন্যরকম আচরণ করতে বাধ্য হবে অবশ্য ক্রিমিনাল নিজে !

মিসেস সেন হঠাৎ হাত তালি দিয়ে উঠেন : গ্র্যাণ্ড আইডিয়া। খেলাটা জমবে! ঠিক পার্টিতে যেমন হয়।

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

রাত আটটা পঁচিশ।

বাসু-সাহেব রিভালভারটা নিয়ে উত্তরের বারান্দায় চলে গেলেন। বসলেন গিয়ে ইজিচেয়ারে। অরূপ অঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাণী দেবী তাঁর হুইল চেয়ারে বসে আছেন জানালার দিকে মুখ করে—উৎকর্ণ হয়ে আছেন, কখন ঢং করে বেজে উঠবে হল-ঘরের দেওয়াল ঘড়িটা।

কৌশিক টর্চ নিয়ে মই বেয়ে ছাদে উঠে গেল। আলি-সাহেব পড়া বইয়ের শেষ কটা পাতা আবার পড়তে বসেছেন। কাবেরী উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে তার বিছানায়—কখন শুরু হয় গান। সুজাতা রান্নাঘরে। ডক্টর সেন বললেন, কাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় তুমি ডীল করছিলে, তাসটা ধর।

অজয় চাটুজ্জে আহ্নিকে বসেছেন। অন্তত আজকের রাতে।

আটটা আঠাশ। সুবীর রায়ের বাথরুমে কলের জল পড়তে শুরু করল।

দু-নম্বর ঘর।

রাণী দেবী নিজের মণিবন্ধে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন : আটটা উনত্রিশ।

খুট করে শব্দ হল পিছনে। রাণী হুইলড চেয়ারটা ঘুরিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ওঁর থেকে হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুবীর রায়।

: কী ব্যাপার? আপনি?

: আপনাকে আর গান গাইতে হবেনা মিসেস বাসু!

: হবে না! সে কি? বাড়ি শুদ্ধ সবাই যে আমার গান শুনতে—

ঃ আপনার গান নয়, ওঁরা উৎগ্রীব হয়ে আছেন সত্যিকারের রাণী দেবীর গান শুনতে।

ঃ মানে ?

ঃ মানে এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সহদেব দুই কে তা জানা গেছে !

ঃ আপনি জানেন ?

ঃ জানি ! আপনিও এখনই জানবেন—

দো-তলায় সাত নম্বর ঘর।

কাবেরী বসেছিল খাটে। শুনল শুরু হয়ে গেল গান ঃ

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।"

এক লাইন গান হতেই ঢং করে সাড়ে আটটা বাজল। রাণী দেবী কয়েক সেকেণ্ড আগেই শুরু করেছেন তাহলে। শুরু হতেই বেজে উঠল পিয়ানো। কালকের মতই রাণী দেবী চুপ করে গেলেন। এক লাইন শুধু পিয়ানো বেজে গেল। তারপর শুরু হল যৌথসঙ্গীত। কণ্ঠসঙ্গীত আরে যন্ত্রসঙ্গীত। কাবেরী খাট থেকে নামল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। ঠিক কালকের মত রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। গান তখন পৌঁছেছে সঞ্চারীতে ঃ

> "এই বেদনার ধন সে কোথায় ভাবি জনম ধরে,
> ভুবন ভরে আছে যেন, পাইনে জীবন ভরে ॥"

হঠাৎ সচকিত হয়ে কাবেরী লক্ষ্য করে বিদ্যুতগতিতে মই বেয়ে নেমে আসছে কৌশিক। দ্বিতলে সে মুহূর্তের জন্যও দাঁড়ালো না, কালকের মত। যেন তাকে পিছন থেকে তাড়া করেছে উদ্যত পিস্তল এক খুনী আসামী। প্রাণপণে সে ছুটে নেমে গেল একতলায়। কী ব্যাপার ! কৌশিক তো নিয়ম মানছে না। গতকালকার আচরণের পুনরাভিনয় তো সে করল না ! চকিতে কাবেরীর মনে হল তবে কি কৌশিক—

কৌশিকের দোষ নেই। বেচারি নির্দেশমত মই বেয়ে ছাদে উঠে গিয়েছিল ঠিকই! কিন্তু গান শুরু হতেই ওর কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। 'ওর মনে হল ইব্রাহিমের পরিত্যক্ত সেই 'এক : দুই : তিন' লেখা কাগজখানার' কথা। ওর মনে হল—আততায়ী কাল যে সুযোগ পেয়েছিল ঠিক সেই সুযোগ ওরা যৌথভাবে তাকে পাইয়ে দিচ্ছে! হুবহু এক পরিবেশ! খুনীটা কি এই সুযোগ নেবে না? যদি নেয়? কে তার তিন নম্বর টার্গেট?

ভেসে আসছে অস্ফুট সঙ্গীত :

"কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে ফিরি আমি কাহার পিছে

সব কিছু মোর বিকিয়েছে, পাইনি তাহার দাম॥"

কৌশিকের মনে হল এই মুহূর্তেই বুঝি তার সব কিছু বিকিয়ে যেতে বসেছে! হয়তো এতক্ষণে খুনিটা কিচেন-ব্লকে ঢুকে— !

সব কিছু ভুল হয়ে গেল কৌশিকের। সে বিদ্যুৎ বেগে নেমে এল একতলায়!

আবার ঐ দু-নম্বর ঘর। রাণী দেবী আর সুবীর রায়। মুখোমুখি। রাণী রীতিমত আতঙ্কতাড়িত। বলছে, এসব কী বলছেন আপনি! আমি···আমি কী দোষ করলাম?

নেপথ্যে তখন শোনা যাচ্ছে গান এবং যন্ত্রসঙ্গীত।

সুবীর বললে, দোষ করেছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু! প্রায়শ্চিত্ত করবেন তাঁর স্ত্রী! আপনি!

পকেট থেকে একটা রিভালভার বার করল সুবীর।

রাণী আর্তনাদ করতে গেলেন। স্বর ফুটল না তাঁর কণ্ঠে।

কিচেন-ব্লকটা অন্ধকার। মোমবাতি নিবে গেছে ঝোড়ো হাওয়ায়। কৌশিক টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখল। সুজাতা কোথাও নেই। অস্ফুটে একবার ডাকল, সুজাতা!

কেউ সাড়া দিল না।

কৌশিক ঘুরে দাঁড়ায়। ছুটে বেরিয়ে আসে দক্ষিণের বারান্দায়। পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ে ডাইনিং রুমে। সেখানেও কেউ নেই—কিন্তু ও কী! পিয়ানোর টুলে তো সুবীর রায় বসে নেই। অথচ কী আশ্চর্য! গান হচ্ছে! পিয়ানো বাজছে! যন্ত্রসঙ্গীত আর কণ্ঠসঙ্গীত যৌথভাবে ফিরে এসেছে স্থায়ীতে ঃ

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা—"

হঠাৎ কে যেন স্পর্শ করল ওর বাহুমূল। চম্‌কে উঠল কৌশিক। দেখে সুজাতা। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে সুজাতা ওর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করছে। কৌশিক ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসে। চার-নম্বর ঘরের পর্দা সরিয়ে সুজাতা প্রবেশ করল সুবীর রায়ের ঘরে। কৌশিক তার পিছন পিছন। ঘর নিরন্ধ্র অন্ধকার—কিন্তু সেই ঘরই হচ্ছে সঙ্গীতের উৎস। টর্চ জ্বালল সুজাতা ঃ

টেবিলের উপর একটা ব্যাটারি-সেট টেপ-রেকর্ডার চক্রাবর্তনের পথে গাইছে ঃ "—তোমায় জানতাম!

কে যে আমায় কাঁদায় আমি কি জানি তার নাম॥"

কৌশিক সুজাতার বাহুমূল ধরে এবার টানে। বলে, কুইক!

ঃ কী?

ঃ বাসু-সাহেব অথবা রাণী দেবী!

ওরা ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়। ঠিক তখনই হল একটা ফায়ারিঙের শব্দ! ঠিক পাশের ঘর থেকে কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ে। গুলিটা যেন তারই পাঁজরে বিঁধেছে।

সুজাতা শুধু বললে, সব শেষ হয়ে গেল!

গুলির শব্দ শুনে সকলেই নেমে এসেছে। ডক্টর আর মিসেস সেন, কাবেরী, আলি আর অজয়বাবু প্রায় একই সঙ্গে প্রবেশ করলেন ডাইনিং রুম পার হয়ে ড্রইংরুমে। আলি টর্চ জ্বাললেন। আশ্চর্য! পিয়ানোর টুলে কেউ নেই। ভূতলেও নেই!

ঠিক তখনই চার-নম্বর ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে এল কৌশিক আর সুজাতা। কৌশিক বললে, কুইক! আসুন আপনারা—

ওরা হুড়মুড়িয়ে বার হয়ে এল উত্তরের বারান্দায়। টর্চের আলো পড়ল বাসু-সাহেবের চিহ্নিত ইজি-চেয়ারে। সেটা ফাঁকা। এবার ওরা সদলবলে ঢুকে পড়ে বাসু-সাহেবের ঘরে।

ভাগ্যক্রমে ঠিক তখনই লাইট-কানেকসানটা ফিরে এল। আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল 'রিপোস্'।

অরূপরতন শুয়েছিল বাসু-সাহেবের খাটে। বালিশে ভর দিয়ে মাথাটা তুলেছে সে। দু-হাতে মুখ ঢেকে রাণী দেবী নিথর হয়ে বসে আছেন তাঁর চাকা দেওয়া চেয়ারে। ড্রেসিং রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। তাঁর হাতে উদ্যত রিভালভার।

আর মেজেতে লোটাচ্ছে সুবীর রায়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সে।

হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েন ডাক্তার সেন। পরমুহূর্তেই মুখ তুলে বলেন, থ্যাঙ্ক গড! গুলিটা পেল্‌ভিস বোনে লেগেছে। ফেটাল নয়!

গতকালকার উক্তির সজ্ঞান অভিনয় নয়। অরিজিনাল ডায়ালগ!

সুবীরের জ্ঞান ছিল। যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছে।

কৌশিক সবিস্ময়ে বাসু-সাহেবকে বলে, কী ব্যাপার?

বাসু-সাহেব গম্ভীরমুখে বলেন, আঙ্ক সহদেব

: সহদেব! মানে?

রিভালভারটা দিয়ে ভূলুণ্ঠিত সুবীর রায়কে নির্দেশ করে বাসু বলেন, সহদেব দুই! আর্চ গ্যাংস্টার, বাফেলো আমেরিকা!

আট

৫ই অক্টোবর, শনিবার।

ঝলমলে রোদ উঠেছে আজ। মেঘ সরে গেছে। গাঁইতা আর কোদাল নিয়ে গ্যাংকুলিরা নেমেছে কাট-রোড মেরামত করতে। উৎপাটিত টেলিগ্রাফ পোল আবার মাথা তুলে খাড়া হচ্ছে। মিলিটারি জীপ নাচতে নাচতে চলতে শুরু করেছে গর্তে-ভরা কাট-রোড দিয়ে। অনেক কষ্টে এ্যাম্বুলেন্স ভ্যান এসে নিয়ে গেছে দু-জন আহত মানুষকে রিপোস্ থেকে হাসপাতালে।

আজ মেঘভাঙ্গা সকালে সবাই আবার গোল হয়ে বসেছে ড্রইং রুমে। বাসু-সাহেবকে ঘিরে। পরিচিত দলের মধ্যে যোগ হয়েছে একটি নূতন মুখ—দার্জিলিঙ-থানার ও. সি. নৃপেন ঘোষাল। সে কোন টেলিফোন পেয়ে আসেনি। রাস্তায় জীপ চলতে শুরু করা মাত্র নৃপেন চলে এসেছিল ঘুমে। খবর নিতে, রিপোসের অবস্থা। নৃপেন প্রশ্ন করে, আপনি স্যার ঠিক কখন বুঝতে পারলেন ?

ঃ একেবারে প্রথম সাক্ষাত মুহূর্তেই !

ঃ প্রথম সাক্ষাতেই !—চমকে উঠে কৌশিক ঃ কেমন করে ?

ঃ মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছিল সুবীর, আই মীন সহদেব। দোশরা তারিখে রাত এগারোটায় সে নিজেই ফোন করে তোমাদের বলেছিল—'আমি নৃপেন ঘোষাল, ও. সি. দার্জিলিঙ বলছি'। তারপর মধ্যরাত্রে এখানে আসবার আগে সে বাড়ির বাইরে টেলিফোনের লাইনটা ছিঁড়ে ফেলে, যাতে আমরা আর থানার সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারি।

কৌশিক বাধা দিয়ে বলে, সে তো বুঝলাম ; কিন্তু আপনি কেমন করে বুঝলেন—ও জাল ?

: বলছি। পরদিন সকালে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। প্রথম সাক্ষাতেই আমি ইব্রাহিমের সেই 'এক : দুই : তিন' লেখা কাগজটার প্রসঙ্গ তুললাম। সুবীরবেশী সহদেব তখন একটা দুঃসাহস দেখিয়ে বসে। ও চেয়েছিল, আমাদের, মানে তোমাদের ভয় দেখাতে। ভয়ে নার্ভাস করে দিতে। বেড়াল যেমন খেলিয়ে নিয়ে ইঁদুরছানাকে মারে! তাই সে ঐ 'এক : দুই : তিন' লেখা কাগজখানা তোমাদের দেখাতে চাইল। আগে থেকেই সেটা ও নতুন করে লিখে এনেছিল। ও তাই কাগজখানা সকলকে দেখাবার লোভ সামলাতে পারল না। হয়তো ও আমাকে ঐভাবে ঠকাতে চেয়েছিল। পাছে আমি ওর আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাই, তাই ওভাবে ওর অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় মেলে ধরেছিল আমার কাছে---প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, ও নৃপেনের কাছ থেকে আসছে। আর তাতেই ও ধরা পড়ে গেল।

সুজাতা বলে, কেমন করে? কাগজখানা তো আমরাও দেখেছি—

: দেখেছ। কিন্তু তোমরা দেখেছ মাত্র একবার। আমি দেখেছি দুবার। আমার ক্রিমিনাল ল-ইয়ারের চোখ ভুল করেনি। কাগজখানা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম- ওই লোকটাই সহদেব! ও নৃপেনের সহকারী সুবীর রায় নয়!

: কেমন করে?

: নৃপেন যে কাগজটা দেখিয়েছিল সেখানা আর এই কাগজটা হুবহু এক। দুটোই চব্বিশ পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক-পেপার, একই কালো কালি, একই হস্তাক্ষর, একই ভাবে উপর দিকে পারফোরেটেড এবং ডান কোণায় ছেঁড়া। তবু একটি অতি সূক্ষ্ম তফাৎ ছিল। প্রথমবার 'দার্জিলিঙ' শব্দটার শেষ অক্ষরটা ছিল 'ঙ'; দ্বিতীয়বার 'ং'। ব্যস! চূড়ান্ত ভাবে ধরা পড়ে গেল সহদেব।

সুজাতা আবার বলে, কিন্তু কেমন করে?

: বুঝলে না? 'ঙ' মুছে গিয়ে 'ং' এল কেমন করে? ফলে এখানা নতুন করে লেখা। কে লিখেছে? নিঃসন্দেহে যে সেটা দাখিল

করছে। কিন্তু দুটি কাগজের হস্তাক্ষর এক হয় কি করে? অর্থাৎ ঐ আবার ইব্রাহিম—যে লোকটা পয়লা তারিখ কয়েক মিনিটের জন্য ঐ মাস্টার-কী দিয়ে তেইশ-নম্বর ঘরে ঢুকবার সুযোগ পেয়েছিল! রাণু, তোমার মনে আছে আমি তখনই বলেছিলাম সহদেবকে আমি চিনতে পেরেছি, কিন্তু প্রমাণ এমন পাকা নয় যাতে খুনী আসামীর কনভিকৃশান হতে পারে।

মিসেস সেন বলেন, ঈস্! তাই সব জেনে শুনে আপনি ঘাপটি মেরে বসেছিলেন?

ঃ ইয়েস ম্যাডাম! তাই সব জেনে শুনে আমি ঘাপটি মেরে বসেছিলাম। কিন্তু আমার ভুল কোথায় হল জান? আমি ভেবেছিলাম—আমিই ওর সেকেণ্ড টার্গেট। অরূপ নয়। ওখানেই সে আমাকে টেক্কা মেরেছে। কিন্তু তৃতীয়বার আমি আর ভুল করিনি, বুঝতে পেরেছিলাম—এবার ওর টার্গেট হচ্ছে রাণু।

কাবেরী প্রশ্ন করে, কেন? মিসেস বাসু কেন?

ঃ কারণ সহদেব জানত আমি সশস্ত্র আছি। ও বুঝতে পেরেছিল, আমি ওর নাগালের বাইরে, গুলি করতে গেলে গুলি খেতে হতে পারে! তাছাড়া ও জানত রাণুর মৃত্যু আমার কাছে মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক হবে, কারণ—

ঃ কারণ?—সুজাতা জানতে চায়।

বাসু-সাহেব রাণীর দিকে ফিরে বলেন, সবার সামনে বলব?

হতচকিত হয়ে রাণী বলেন, কী?

ঃ রাণুকে আমি ভীষণ ভালবাসি!

সবাই হেসে ওঠে ওঁর ভঙ্গিতে। মিসেস বাসুও রাঙিয়ে ওঠেন। বলেন, ছাই বাস! আচ্ছা ঐ লোকটা যখন আমাকে বলছিল যে, সে আমাকে খুন করতে চায় তখন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমি কী করে চুপ করে ছিলে! তুমি পারলে ঐ খুনীটার সামনে আমাকে ও-ভাবে বসিয়ে রাখতে?

বাসু-সাহেব মুখটা সুচালো করেন। নীরবে মাথাটা নাড়েন সম্মতিসূচকভাবে।

: তোমার একটুও মায়া হল না ?

: কই আর হল রাণু ? মিস্ ডিক্রুজাকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে ওর নিজ মুখে কনফেশান। সেটা তোমার কাছে স্বীকার করার আগে কি আর ওকে নিরস্ত্র করতে পারি ? যতই কেন না ভালবাসি তোমাকে—আমি যে ক্রিমিনাল ল-ইয়ার !

কৌশিক জানতে চায়, আচ্ছা সহদেবের প্ল্যানটা কি ছিল ?

: এখনও বুঝতে পারনি ? রাণী প্রথমবার যখন গানটা গায় তখন সহদেব ছিল তার নিজের ঘরে। চট করে সে গানটা টেপ রেকর্ড করতে শুরু করে। তখনও ওর তৃতীয় এমন কি দ্বিতীয় খুনের পরিকল্পনাও করা ছিল না। গানটা রেকড করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনমত আমাদের ভবিষ্যতে বিভ্রান্ত করা। মিনিট খানেক পরেই সহদেব শোনে অরূপ এসে পিয়ানো বাজাচ্ছে। মুহূর্তমধ্যে সে মনস্থির করে—বাথরুমের কলটা খুলে দেয় এবং অরূপকে গুলি করে বাথরুমে ঢুকে যায়। তারপর ধীরে সুস্থে সে তৃতীয় খুনের পরিকল্পনা করে। ও চেয়েছিল—দ্বিতীয়বার রাণীর গান টেপ-রেকর্ডে "তোমায় জানাতাম" শব্দটায় পৌঁছানোমাত্র যে রাণীকে গুলি করে ছুটে বেরিয়ে যাবে ড্রইংরুমে। ও যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে পিয়ানোর টুলটা ফুট চারেক দূরে, পাশের ঘরে। তোমরা এসে ওকে দেখতে পেতে ড্রইংরুমে পড়ে থাকতে। পরে রাণীর মৃত্যুর তদন্ত যখন হত তখন ওর মোক্ষম এ্যালেবাই থাকত পিয়ানোর শব্দ। রাণী যে আদৌ গায়নি আর ও বাজায়নি তা কেউ কোনদিন জানতে পারত না —একমাত্র রাণীই হতে পারত সে ঘটনার সাক্ষী; কিন্তু তৃতীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্ত যখন হত তখন রাণীর এজাহার আর নেওয়া যেত না—

নৃপেন বলে, কিন্তু ওর টেপ রেকর্ডার আর ডিসচার্জড রিভলভারটা তো আমরা তদন্তের সময় খুঁজে পেতাম। ও যে আদৌ পিয়ানো বাজাতে জানে না এটা প্রমাণ করতাম !

: না, দারোগা-সাহেব, তা পেতে না ! ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী পেতে না। সে রাত দশটার মধ্যেই 'থানায় যাচ্ছি' বলে বেরিয়ে যেত। তাকে আমরা সবাই পুলিশ-অফিসার বলে মেনে নিয়েছিলাম —ফলে আমরা তাতে আপত্তি করতাম না। সহদেব অনায়াসে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত !

কাবেরী বলে, উঃ ! কী ভীষণ !

বাসু-সাহেব বলেন, তুমিই কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছ কাবেরী !

: আমি ! ওমা, কেন ? কি করে ?

: কার্শিয়াঙে তোমার বান্ধবী অথবা বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করে !

কাবেরী অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষে সামলে নিয়ে বলে, আপনি কেমন করে জানলেন ?

: জানি না। আন্দাজ করছি। তুমি নিজেই সুজাতাকে বলেছিলে যে, কার্শিয়াঙে তুমি আশ্রয় নিয়েছিলে 'বন্ধুস্থানীয় একজনের' কাছে। রাত থাকতেই বাসিমুখে কেউ বন্ধুস্থানীয় লোকের বাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সি নিয়ে বের হয় না। তাই অনুমান করতে অসুবিধা হয় না—একটা রাগারাগি নিশ্চয় হয়েছিল। অবশ্য 'রাগ' শব্দটা বাঙলা না সংস্কৃতে সেটা হলপ করে বলতে পারব না। ওটা 'অভিমান'ও হতে পারে। তিনি 'বান্ধবী' না 'বন্ধু' তা জানা না থাকায় সঠিক কনক্লুশনে আসা যাচ্ছে না—

কাবেরী একেবারে লাল হয়ে যায়।

বাসু-সাহেব তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে বলেন, তাছাড়া এখানে ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার সময় নিজের ঘরটা তালাবন্ধ না করেও তুমি ব্যাপারটা গুলিয়ে তুলেছ। তুমি জান না—তোমার ঘরে এ্যাসট্রের

ভিতর সহদেব ক্রমাগত 'ফিল্টার টিপ্‌ট্‌ সিগারেটের স্ট্যাম্প ফেলে গেছে ?

: সে কি ! কেন ?

: যাতে তোমাকে মিস্ ডিক্রুজা বলে আমি ভুল করি।

: আপনি আমাকে তাই ভেবেছিলেন ?

: না ভাবিনি। অরূপ তোমাকে চার্চে দেখা একটি ক্রিশ্চিয়ান মেয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলায় একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম অবশ্য—কিন্তু ক্রমশঃ আমি বুঝতে পারলাম সহদেব নিজেই লুকিয়ে ঐ সিগারেটের স্ট্যাম্প ফেলে আসছে। তাই সহদেবকে বুঝতে দিয়েছিলাম যে, আমি ওর ফাঁদে পা দিয়েছি। তাকে তাই বলেছিলাম—মিস্ ডিক্রুজাকেও আমি সনাক্ত করেছি এই হোটেলে !

নৃপেন বলে, মিস্ ডিক্রুজা তাহলে নিরাপরাধ ?

একটা অপরাধ সে করেছে। মেয়েটা ছিল কল-গাল। রমেনের সঙ্গে তার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাই রমেন তোমার বাড়িতে রাতে থাকতে রাজী হয়নি। পয়লা তারিখ গভীর রাত্রে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে মেয়েটা রমেনের ঘরে ঢোকে। হয়তো অনেকক্ষণ বসেও ছিল। সিগ্রেট যে খেয়েছিল তার প্রমাণই তো আছে। হয়তো তার চোখের সামনেই মদ্যপান করতে গিয়ে রমেন গুহ মারা যায়। মিস ডিক্রুজার একমাত্র অপরাধ তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর না দিয়ে সে রাত ভোর হতেই পালিয়ে যায়।

নৃপেন গম্ভীরস্বরে বলে, গুরুতর অপরাধ !

বাসু-সাহেব বলেন, কিন্তু তার অবস্থাটাও বোঝ ! বেচারি ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে ঘরে ঢুকেছে—খুনের দায়ে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ত। তাছাড়া অমন মেয়ে নিশ্চিত মদ খায়—হয়তো একচুলের জন্য সে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে—যাকে বলে between the cup and the lip !

অধিবেশন ভঙ্গ হলে নৃপেন বাসু-সাহেবকে জনান্তিকে বলে, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট-কথা ছিল স্যার—

বাসু-সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, মনে আছে! আমি বলব!

নৃপেন অবাক হয়ে বলে, মানে! কাকে কি বলবেন?

ঃ বিপুলকে তোমার সাবস্টিটুটের কথা তো? বলব আমি।

ঃ নৃপেন যেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে এসেছে! লোকটা কি অন্তর্যামী!

ঘণ্টাখানেক পরে।

সুজাতা কিচেনে ব্যস্ত। আজ পোলাও হবে! জবর খানার আয়োজন। কৌশিক নিঃশব্দে প্রবেশ করল পিছন থেকে। সুজাতা তখন কাজ করতে করতে গুন গুন করে তান ভাজছিল ঃ মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি—

ঃ এতক্ষণে গান বেরিয়েছে গলায়?

চমকে ঘুরে দাঁড়ায় সুজাতা। বলে, ও তুমি! আমি ভেবেছি—বিভীষণ?

ঃ বিভীষণ?

সে কথার জবাব না দিয়ে সুজাতা ঘনিয়ে আসে। বলে, এই! আজ না পাঁচুই অক্টোবর?

ঃ হুঁ! তাই কি?

ঃ বা-রে আমার সেই সোনার কাঁটাটা?

ঃ ও আয়াম সরি। ওটা আমার পকেটেই রয়ে গেছে, নয়?

কৌশিক পকেট থেকে বার করে গহনার বাক্সটা।